জাজ পাস থেকে দেখা যমজ লেক - গঙ্গাবল আর নন্দকুল - আলোকচিত্রী- অভিষেক দত্ত

বেড়ানোর কথা
আর ছবি নিয়ে
বাংলা
ই-ম্যাগাজিন

আমাদের বাংলা | আমাদের দেশ | আমাদের পৃথিবী | আমাদের কথা

~ ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা - মাঘ ১৪২৩ ~

সকলেরই যাওয়া থাকে, একটা গন্তব্য থাকে, ফিরে আসাও থাকে যথাসময়ে। এরই নাম হয়তো ভ্রমণ যা জুড়ে থাকে আজীবন।

হালকা ভিড়। ট্রেন দিয়ে দিয়েছিল বেশ খানিকক্ষণ। অসংরক্ষিত কামরাগুলো ভরে উঠেছে তাই। ইতস্তত দেখতে দেখতে এক জায়গায় সাদর আমন্ত্রণ পাই - আইয়ে মেমসাব। আপকে লিয়ে হি খালি রাখখা হুঁ। অবাক হলেও বসে পড়ি জমিয়েই। ব্যাগপত্তর ওপরে তুলে দিই। সামনে একটি মুসলিম পরিবার। মাঝবয়সী বউটি মিটিমিটি হাসে। চেহারায় তেমন কোনও বৈশিষ্ট্য নেই যে আঁকা যাবে। পাশে বছর নয়-দশের গোলাপী- কমলা সালোয়ার কামিজে চঞ্চল মেয়ে। মায়ের পরণে কালোতে-হলুদে সালোয়ার কামিজ, মাথায় ওড়নার ঘোমটা। স্বামীটির চেহারাও একেবারে সাদামাটা। অল্প কাঁচাপাকা চুল-দাড়িতে ঝিমন্ত মুখ। এপাশে ওপাশে আরও আরও বিশেষত্বহীন মহিলা-পুরুষের মুখ। কেউ ব্যস্ত শিশু নিয়ে, কেউ মোবাইল। কেউবা জানলার দিকে উদাসীন। এরাই হাসিমুখে তাকায়। বসতে দেয় ডেকে। এরাই ভারতবর্ষ।

ট্রেন স্লো হয়। হঠাৎ আবির্ভাব ঘটে এক হিজড়ে রমণীর। হাততালি আর হাসির বিনিময়ে কিছু টাকা নিয়ে নেমে যায় স্টেশনে থামার আগেই চলন্ত ট্রেন থেকে। ওদিকে কচি বাচ্চা নিয়ে ওই চলন্ত ট্রেনেই উঠে পড়ে আরেক পরিবার - লোকজনের সাবধানতার আর্তনাদের পাশ কাটিয়ে।

মাঝের জংশন স্টেশনে ট্রেন একটু বেশিক্ষণ দাঁড়াতেই ভিড় বাড়ে। এক কাশ্মীরি পরিবার কোলে-কাঁখে বাচ্চা নিয়ে উঠে পড়ে। সিটের ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে যায় কয়েকজন। বাকিরা ওপরে বাঙ্কে। এবারে বন্ধ পাখার ওপরে জমছে জুতো-চটি। অনেকবার দেখেছি এ দৃশ্য, তবু মনে পড়ছে কাঞ্চনের লেখা - 'জিস দেশ মে গঙ্গা বহতি হ্যায়'। বৌটি সবার ছোটটিকে কোলে নিয়ে বসে। আলু চিপস বাচ্চার মুখেও দেয়, তারপর নিজের মুখে ফেলে বলে, নুন। ওপর থেকে বড় দুজন চাইলে চোখ পাকিয়ে বকে - চুপ। বাবা আবার তাদের জন্যও কেনে। বিস্কুটে, চিপসে খুশী বাচ্চারা, সবারই হাতে হাতে কিছু ধরিয়ে দিয়েছে বাবা-মা।

এবারে ঝালমুড়িওলার সঙ্গে গুঁতোগুঁতি লেগেছে পরের চিপসওলার। ঝালমুড়ির বিক্রি দেখে সে বিরক্ত হয়ে পাশ কাটাতে গিয়ে বাধা পেয়ে ট্রেনটি ঝালমুড়িওলার পৈত্রিক সম্পত্তি কিনা সেই বিষয়ক গালাগালি দিয়ে ওঠে। ঝালমুড়িওলা অভ্যস্ত নির্বিকার। ওদিকে টাক দুমাদুম আওয়াজ পেয়ে সচকিত হই। সামনের চঞ্চল মেয়েটি বাবার কোলের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে আপনমনে হেসে লুটায়। এতক্ষণে তার ও তার মায়ের সঙ্গে ভাবও হয়েছে খানিক। নাম তার মীনা। মীনার মা মেয়ে আর স্বামীকে নিয়ে কলকাতায় বাপের বাড়ি থেকে ফিরছে জম্মুতে নিজের ঘরে। ছেলে আছে সেখানে। মীনা আর তার বাবার খুনসুটি চলছে প্রায় সারাক্ষণ।

তাকিয়ে দেখি ছোট্ট একটি বাচ্চা কোলে নিয়ে মা, হাতে ছোট ঢোলক। সেই ঢোলকের তালে তালে হাতে লোহার রিং নিয়ে শারীরিক কসরত দেখায় বড় মেয়ে। বয়স বছর ছয়-সাত হবে হয়তো। শিশু দেখে অনেকেই তার বাটিতে, হাতে টাকা-পয়সা দেয়। মায়ের কোল থেকে অবোধ ছোটটি হেসে ওঠে একবার।

মীনার মায়ের সঙ্গে টুকটাক কথা হচ্ছে কাশ্মীরি বৌটির। মীনার মায়ের মৃদু কণ্ঠস্বর প্রায় শোনা যায় না। অন্যজনের জীবনকাহিনির আভাস পাই পরের বড় স্টেশন আসতে আসতেই - এদিককারই মেয়ে। বাপ-মা নেই। খালা বিয়ে দিয়ে দিয়েছে এত দূরে। একবার গেলে আবার কবে ফিরব কে জানে! কিছু বলার ছিল না। তবে জীবনে খাওয়া তো বড় কথা নয়, ভালো থাকাটাই আসল। ভারতবর্ষ এবার কথা বলে ওঠে পরিষ্কার বাংলায়।

বৌটি দুরন্ত ছোটটিকে সামলাতে না পেরে হাসতে হাসতে যেন সবাইকে উদ্দেশ্য করেই জোরে বলে ওঠে, ইয়ে বঙ্গাল কা বাচ্চা তো নেহী কাশ্মীরকা বাচ্চা। কাশ্মীরকা আদমী ভি কুছ নেহী শুনতা, বচ্চা ভি। ওদিকে চানাওলা চানা মাখতে মাখতে অমরেশ পুরীর সিনেমার কথা বলে তার ক্রেতাকে। হঠাৎ কানে আসায় কার্যকারণ বুঝে উঠতে পারিনা।

সকালেও খুব ঠান্ডা ছিল। বেলা বাড়তেই ঝলমলে রোদ্দুর। জানলার বাইরে সবুজের সমারোহ, কাঁচা-পাকা ঘরবাড়ি, ঝমঝম করে ব্রিজ পেরোল গঙ্গার।

সেও তো অনেকক্ষণ। এখন দুপাশে ধান কাটা আদিগন্ত ন্যাড়া ক্ষেত, আঁকাবাঁকা আল আর মাঝে মাঝে এক একটা ঝাঁকড়া সবুজ গাছ।

সব পেছনে ফেলে এগিয়ে যাই।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

বেড়ানোর কথা
আর ছবি নিয়ে
বাংলা
ই-ম্যাগাজিন

আমাদের বাংলা | আমাদের দেশ | আমাদের পৃথিবী | আমাদের কথা

~ ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা - মাঘ ১৪২৩ ~

সকলেরই যাওয়া থাকে, একটা গন্তব্য থাকে, ফিরে আসাও থাকে যথাসময়ে। এরই নাম হয়তো ভ্রমণ যা জুড়ে থাকে আজীবন।

হালকা ভিড়। ট্রেন দিয়ে দিয়েছিল বেশ খানিকক্ষণ। অসংরক্ষিত কামরাগুলো ভরে উঠেছে তাই। ইতস্তত দেখতে দেখতে এক জায়গায় সাদর আমন্ত্রণ পাই - আইয়ে মেমসাব। আপকে লিয়ে হি খালি রাখখা হুঁ। অবাক হলেও বসে পড়ি জমিয়েই। ব্যাগপত্তর ওপরে তুলে দিই। সামনে একটি মুসলিম পরিবার। মাঝবয়সী বউটি মিটিমিটি হাসে। চেহারায় তেমন কোনও বৈশিষ্ট্য নেই যে আঁকা যাবে। পাশে বছর নয়-দশের গোলাপী- কমলা সালোয়ার কামিজে চঞ্চল মেয়ে। মায়ের পরণে কালোতে-হলুদে সালোয়ার কামিজ, মাথায় ওড়নার ঘোমটা। স্বামীটির চেহারাও একেবারে সাদামাটা। অল্প কাঁচাপাকা চুল-দাড়িতে ঝিমন্ত মুখ। এপাশে ওপাশে আরও আরও বিশেষত্বহীন মহিলা-পুরুষের মুখ। কেউ ব্যস্ত শিশু নিয়ে, কেউ মোবাইল। কেউবা জানলার দিকে উদাসীন। এরাই হাসিমুখে তাকায়। বসতে দেয় ডেকে। এরাই ভারতবর্ষ।

ট্রেন স্লো হয়। হঠাৎ আবির্ভাব ঘটে এক হিজড়ে রমণীর। হাততালি আর হাসির বিনিময়ে কিছু টাকা নিয়ে নেমে যায় স্টেশনে থামার আগেই চলন্ত ট্রেন থেকে। ওদিকে কচি বাচ্চা নিয়ে ওই চলন্ত ট্রেনেই উঠে পড়ে আরেক পরিবার - লোকজনের সাবধানতার আর্তনাদের পাশ কাটিয়ে।

মাঝের জংশন স্টেশনে ট্রেন একটু বেশিক্ষণ দাঁড়াতেই ভিড় বাড়ে। এক কাশ্মীরি পরিবার কোলে-কাঁখে বাচ্চা নিয়ে উঠে পড়ে। সিটের ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে যায় কয়েকজন। বাকিরা ওপরে বাঙ্কে। এবারে বন্ধ পাখার ওপরে জমছে জুতো-চটি। অনেকবার দেখেছি এ দৃশ্য, তবু মনে পড়ছে কাঞ্চনের লেখা - 'জিস দেশ মে গঙ্গা বহতি হ্যায়'। বৌটি সবার ছোটটিকে কোলে নিয়ে বসে। আলু চিপস বাচ্চার মুখেও দেয়, তারপর নিজের মুখে ফেলে বলে, নুন। ওপর থেকে বড় দুজন চাইলে চোখ পাকিয়ে বকে - চুপ। বাবা আবার তাদের জন্যও কেনে। বিস্কুটে, চিপসে খুশী বাচ্চারা, সবারই হাতে হাতে কিছু ধরিয়ে দিয়েছে বাবা-মা।

এবারে ঝালমুড়িওলার সঙ্গে গুঁতোগুঁতি লেগেছে পরের চিপসওলার। ঝালমুড়ির বিক্রি দেখে সে বিরক্ত হয়ে পাশ কাটাতে গিয়ে বাধা পেয়ে ট্রেনটি ঝালমুড়িওলার পৈত্রিক সম্পত্তি কিনা সেই বিষয়ক গালাগালি দিয়ে ওঠে। ঝালমুড়িওলা অভ্যস্ত নির্বিকার। ওদিকে টাক দুমাদুম আওয়াজ পেয়ে সচকিত হই। সামনের চঞ্চল মেয়েটি বাবার কোলের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে আপনমনে হেসে লুটায়। এতক্ষণে তার ও তার মায়ের সঙ্গে ভাবও হয়েছে খানিক। নাম তার মীনা। মীনার মা মেয়ে আর স্বামীকে নিয়ে কলকাতায় বাপের বাড়ি থেকে ফিরছে জম্মুতে নিজের ঘরে। ছেলে আছে সেখানে। মীনা আর তার বাবার খুনসুটি চলছে প্রায় সারাক্ষণ।

তাকিয়ে দেখি ছোট্ট একটি বাচ্চা কোলে নিয়ে মা, হাতে ছোট ঢোলক। সেই ঢোলকের তালে তালে হাতে লোহার রিং নিয়ে শারীরিক কসরত দেখায় বড় মেয়ে। বয়স বছর ছয়-সাত হবে হয়তো। শিশু দেখে অনেকেই তার বাটিতে, হাতে টাকা-পয়সা দেয়। মায়ের কোল থেকে অবোধ ছোটটি হেসে ওঠে একবার।

মীনার মায়ের সঙ্গে টুকটাক কথা হচ্ছে কাশ্মীরি বৌটির। মীনার মায়ের মৃদু কণ্ঠস্বর প্রায় শোনা যায় না। অন্যজনের জীবনকাহিনির আভাস পাই পরের বড় স্টেশন আসতে আসতেই - এদিককারই মেয়ে। বাপ-মা নেই। খালা বিয়ে দিয়ে দিয়েছে এত দূরে। একবার গেলে আবার কবে ফিরব কে জানে! কিছু বলার ছিল না। তবে জীবনে খাওয়া তো বড় কথা নয়, ভালো থাকাটাই আসল। ভারতবর্ষ এবার কথা বলে ওঠে পরিষ্কার বাংলায়।

বৌটি দুরন্ত ছোটটিকে সামলাতে না পেরে হাসতে হাসতে যেন সবাইকে উদ্দেশ্য করেই জোরে বলে ওঠে, ইয়ে বঙ্গাল কা বাচ্চা তো নেহী কাশ্মীরকা বাচ্চা। কাশ্মীরকা আদমী ভি কুছ নেহী শুনতা, বচ্চা ভি। ওদিকে চানাওলা চানা মাখতে মাখতে অমরেশ পুরীর সিনেমার কথা বলে তার ক্রেতাকে। হঠাৎ কানে আসায় কার্যকারণ বুঝে উঠতে পারিনা।

সকালেও খুব ঠান্ডা ছিল। বেলা বাড়তেই ঝলমলে রোদ্দুর। জানলার বাইরে সবুজের সমারোহ, কাঁচা-পাকা ঘরবাড়ি, ঝমঝম করে ব্রিজ পেরোল গঙ্গার।

সেও তো অনেকক্ষণ। এখন দুপাশে ধান কাটা আদিগন্ত ন্যাড়া ক্ষেত, আঁকাবাঁকা আল আর মাঝে মাঝে এক একটা ঝাঁকড়া সবুজ গাছ।

সব পেছনে ফেলে এগিয়ে যাই।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

উটের পিঠ থেকে পৃথিবীটা ভারী চমৎকার লাগছিল। সামনে দিগন্তবিস্তৃত বালুভূমি। দুপাশে পাহাড়। দূরে গাছপালা। আর আকাশে গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা মেঘ ভিড় করে এসেছে যেন। দূরে দেসকিট মনাস্ট্রি দেখা যাচ্ছে।

- ধারাবাহিক ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র - লাদাখ পর্ব-এর দ্বিতীয় পত্র
দময়ন্তী দাশগুপ্তের কলমে

কচ্ছের রান - সীমাহীন ধবলতা ও মনু সাঁইয়া
- সোমনাথ ভট্টাচার্য

বালিপাসে মুখোমুখি - সুমন বিশ্বাস

~ আরশিনগর ~

দুর্গাপুর - ইতিহাসের খোঁজে - তপন পাল

বঙ্গের উত্তরে - দেবাশিস রায়

~ সব পেয়েছির দেশ ~

স্বর্গরাজ্যের সপ্তহ্রদ - পর্ণা সাহানা

উত্তর-পুবের জঙ্গল-পাহাড়ে - জাহির রায়হান

~ ভুবনডাঙা ~

স্মোকি মাউন্টেনের অরণ্যে - কালিপদ মজুমদার

ব্রাজিলে দিনকয়েক - বনানী মুখোপাধ্যায়

~ শেষ পাতা ~

পরিযায়ীদের সংসারে – পলাশ পান্ডা

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি - ২য় পর্ব

আগের পর্ব – প্রথম পত্র

ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র - লাদাখ পর্ব

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

~ *লাদাখের আরও ছবি* ~

দ্বিতীয় পত্র

বন্ধুবর,

লাদাখ বেড়ানোর তৃতীয় দিনের গন্তব্য নুব্রা ভ্যালি - হুন্ডার। কোল্ড ডেজার্ট। আর দু-কুঁজওয়ালা ব্যাকট্রিয়ান উট ও পশমিনা ভেড়ার দেশ। এখানে সিন্ধু নদের উপনদী শায়ক মিশেছে নুব্রা বা সিয়াচেন নদীর সঙ্গে। তারই বিস্তীর্ণ উপত্যকা লাদাখ পাহাড়শ্রেণীকে আলাদা করেছে কারাকোরাম রেঞ্জ থেকে। উপত্যকার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মোটামুটি ১০,০০০ ফিট বা ৩০৪৮ মিটার।
ডায়েরির পাতা ওল্টাই এবার। লেখাগুলো একটু ছেঁড়া, ছেঁড়া - ঠান্ডায় আর গাড়ির ঝাঁকুনিতে পথ চলার মতই থমকে থমকে।

১৪/১০/২০১৫
সকাল ৯-৪০। লেহ
ন্যাড়া পাহাড়ের পাশ দিয়ে গাড়ি এগোচ্ছে। পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা। প্রথমদিকে বরফমাথা পাহাড়ে সূর্যের আলোয় চোখ ঝলসাচ্ছিল। এখন ন্যাড়া পাহাড়ের গায়ে শুধু ঘাস-গুল্ম। বড় গাছেরা অনেক নীচে। এর আগে ঘাসগুলোর গায়ে লাল লাল ছোট্ট ছোট্ট ফুল চোখে পড়ছিল। এখন হলুদ ফুলে আলো হয়ে আছে। আকাশে আজ গাভীর মতো চড়ছে মেঘেরা। তাদের রঙ সাদা বা ধূসর। ওরই ফাঁক দিয়ে ঝলমলে রোদ্দুর এসে পড়ছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে।

সকাল ১০-৩০। সাউথ পুল্লু
ছোট্ট জনপদ। চেকিং পয়েন্ট। পিচরাস্তা শেষ হয়ে কিছুদূর গিয়ে একটা ছোট লেক চোখে পড়ল। খানিক বাদে ফের পিচের রাস্তায় উঠে এলাম। এবার বরফ পাহাড়ের দেখা মিলছে আবার। ক্রমশঃ কাছে চলে আসছে। নেড়া পাহাড়ের গায়ে শ্বেত আবরণ। পাহাড়ের গায়ে রোদ্দুর এসে পড়েছে। রাস্তা খুব খারাপ। সত্যি বলতে কী টানাই খারাপ রাস্তা। মাঝে মাঝে সারাইয়ের কাজ চলছে। অধিকাংশই মহিলা শ্রমিক। রাস্তা এতটাই খারাপ যে গাড়ি মোটামুটি লাফাতে লাফাতে চলেছে। সৌম্যর বক্তব্য, 'ঘোড়ার পিঠে উঠেছি মনে হচ্ছে।' পাহাড়ের গায়ে অজস্র আলগা পাথর, যে কোনও সময়ে গড়িয়ে পড়তে পারে। পড়েও আছে রাস্তায়। বুলডোজার দিয়ে বড় বড় পাথর সরানোর কাজও চলছে মাঝে মাঝে। এবারে সামনে মিলিটারি ট্রাকের সারি। ব্যস হয়ে গেল। পিছন পিছনই চলতে হবে অনন্তকাল। কিছুতেই পথ দেয়না এরা। পুরো রাস্তা জ্যাম হয়ে গেছে।
রাস্তার পাশে এবার পুরোটাই বরফের পাহাড়। ফাঁকে ফাঁকে পাথর দেখা যাচ্ছে। উলটোদিকের পাহাড়ের গা ন্যাড়া। আবার কখনও আমরা ন্যাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলেছি, বিপরীতে বরফ পাহাড়।
আরও অনেকটাই উঠে এসেছি। খুব ঘুম পাচ্ছে। এটা কি অক্সিজেনের স্বল্পতার জন্য?

দুপুর ২-৩০। খারদুং লা
শায়ক নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছি। নদীখাত বিস্তীর্ণ। কিন্তু এখন শুধু নীল জলের সরু সরু ধারা হয়ে রয়েছে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে নদীর পাশে কোথাও কোথাও ছড়ানো-ছিটানো গাছপালা, বাড়ি। প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে বাইরে।
খারদুং লা-র আগে অবধি রাস্তা এতটাই খারাপ ছিল যে ঝাঁকুনি খেতে খেতে শরীরের সব তালগোল পাকিয়ে গেছে।

বরফে মোড়া খারদুং পাসে নেমে পড়লাম সকলেই। বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মোটরেবল রোড বলে এর যে পরিচিতি রয়েছে তা অবশ্য ঠিক নয় - সেই তালিকায় খারদুং লা-র স্থান আসলে এগার নম্বরে। এমনকি লেহ থেকে প্যাংগং সো যাওয়ার পথে চ্যাং লা-ও নাকি এর থেকে উঁচু! যাইহোক চারদিক বরফে সাদা হয়ে আছে। তুমুল ঠান্ডায় শরীরের খোলা অংশ জমে যাচ্ছে। তাও বরফ ভেঙে কিছুটা ওপরে ওঠা আর বরফ ছোঁড়াছুঁড়ি - ও তো হবেই। ড্রাইভার তুন্ডুপ ভাইয়া তাড়া লাগান। আমরাও গাড়িতে ফিরে আসি। হুন্ডার এখনও ছিয়াশি কিলোমিটার।

খারদুং ছোট্ট জনপদ। পাসের কিছুটা পরেই। ওখানেই কেউ ডালেভাতে কেউ বা নুডলসে খাওয়া সেরে নিলাম।

বরফ পাহাড় পেরিয়ে আবার রঙিন পাহাড়ের এলাকায় এসে পড়েছি। সাদা, কালো, লাল, সবুজ...। কেমিস্ট্রির অধ্যাপক চন্দনদার কাছে এই রঙের ব্যাখ্যা খুঁজেছি মাঝে মধ্যেই। এক জায়গায় ক্যানিয়নের মতো হয়ে রয়েছে।

দুপুর ২-৪৫। খালসার

এও খুব ছোট জনপদ। ২০১০ সালের হড়কা বানের চিহ্ন এখনও বর্তমান। অনেকটা অংশই মিলিটারি অধ্যুষিত। একটু এগিয়ে লাল, সবুজ, হলুদ ঝোপ ঝোপ ধরণের গাছ চোখে পড়ল।

এবারে একেবারে নদীর পাশ দিয়ে যাওয়া। নীল জলে সাদা ঢেউয়ে হলুদ পাহাড়ের ছায়া। নীল-হলুদে মিলে মিশে সবুজ। পাহাড় ছেড়ে উপত্যকায় নেমে এসেছে গাড়ি। দুপাশের ন্যাড়া উপত্যকায় মাঝে মাঝে রঙিন আগাছা চোখে পড়ছে। মাঝখান দিয়ে পথ গিয়েছে এঁকেবেঁকে। নির্জন। দুপাশে বালি।

আবার পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা। পাশে ঝোপঝাড়ের বদলে কিছুটা বড় গাছ। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে এসেছি অনেকটাই। পাশে বিস্তীর্ণ নদী উপত্যকা বেশ খানিকটা নীচে।

বিকেল ৩-৩০। দিসকিট

কোল্ড ডেজার্টের এলাকায় ঢুকে গেছি। ১০,৪৮০ ফুট ওপরে রয়েছি। শরীরটা বেশ খারাপ লাগছে। হঠাৎ কে যেন 'উট উট' বলতে নড়েচড়ে বসে জানলা দিয়ে দেখি সত্যিই দূরে নিচের বালিয়াড়িতে উট চড়ে বেড়াচ্ছে! দিসকিট এসে গেলাম তাহলে?

১৫/১০/২০১৫

হুন্ডার

গতকাল সন্ধেবেলায় আর ডায়েরি লেখা হয়নি। শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল। দিসকিট ছাড়িয়ে শেষ বিকেলে হুন্ডার পৌঁছে দলের বাকিরা উটের পিঠে চাপতে গেল। বুইকেও পাঠিয়ে দিলাম। আমরা দুজনে গাড়িটা নিয়ে হোটেল খুঁজতে বেরোলাম। বেশ কিছুটা ঘোরাঘুরি করে একটা হোটেল পছন্দ হল - ইউরদুম গেস্ট হাউস। সিজন শেষ হয়ে আসায় অনেক হোটেলই বন্ধ হয়ে গেছে। এটা খানিক হোমস্টে ধরণের - মালকিন আর তার মেয়ে এখানেই থাকে। সিজন শেষ, তাই রাঁধুনি নেই, তবে ডিম-ভাত পাওয়া যাবে রাতে আর আগামীকাল সকালে টোস্ট-ওমলেট। দরাদরি করে মাথাপিছু তিনশ টাকায় থাকা-খাওয়ার রফা হল। হোটেলের সামনে অনেকটা বাগান, বড় বড় ঘর-অ্যাটাচড বাথরুম। সবচেয়ে মজার হল জানলা খুললেই আপেলে ভরে থাকা গাছ চোখে পড়ছে। আমাদের আবার 'বিম্‌লা' হোটেলের আপেল খেতে খেতে কেমন আপেল খাওয়ার নেশা হয়ে গেছে। আর বীরেনের গাছ থেকে আপেল পাড়ারও। সকালে গাড়িতেও সবার হাতে, পকেটে আপেল ছিল। খেতে খেতেই আসা হয়েছে পথে। আমরা হোটেল খুঁজতে বেরোনোর সময়ও বীরেন হেঁকে বলেছিল, দেখিস যেন আপেল গাছ থাকে। পরে ওরা সবাই হোটেলে এলে বীরেন সোজা আপেল গাছের দিকেই তদন্ত করতে গেল - পাড়া এবং তা পারার বিষয়ে। নুব্রায় প্রচুর গাছপালা - পাতা ঝরানোর মরশুমে তাদের বেশির ভাগই এখন লাল, হলুদ, বাদামি রঙে সেজেছে।

সন্ধেয় সবাই বসে আড্ডা - চা আর পকোড়া ম্যানেজ করা গেছে অনেক বলেকয়ে।

সকাল ৯-৩০

নুব্রা লেহ-এর থেকে বেশ নিচে, ঠাণ্ডাও তাই অনেক কম। গরম জলে স্নান সেরে বেশ ফ্রেশ সবাই। সকালে হোটেল থেকে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরোনোর তোড়জোড়। বাইরে আসতেই চোখ টানল সকালের রোদ্দুরে আর ফুলে আলো হয়ে থাকা সামনের বাগান। থোকা থোকা গোলাপে ভরে আছে গাছ। সকলেই যেন গোলাপসুন্দরী। প্যান্জি, পিটুনিয়ারাও দলে বেশ ভারী। চন্দ্রমল্লিকা ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ছে প্রজাপতিরা। সবজির খেতও ভরে আছে হৃষ্টপুষ্ট বাঁধাকপিতে। বাগানের ধার বরাবর বড় গাছেরা সবুজ-সাদা হয়ে ঘিরে রয়েছে। বাইরে বেরোতে গাছেরাও আরও রঙ ছড়াতে লাগলো।

আজ হুন্ডার থেকে দিসকিট মনাস্ট্রি হয়ে লেহ-তে ফেরা। ১২৫ কিমি পথ। হাতে সময় থাকলে হুন্ডার থেকে তুরতুক ঘুরেই ফেরার প্ল্যান ছিল। কিন্তু কাল আমার উটে চাপা হয়নি। আর কি এ জীবনে দু-কুঁজওলা উটে চাপতে পারব? তাই লালমোহনবাবুর জন্য উটই সই। তুরতুকের মায়াবী আকর্ষণ অদেখাই রয়ে গেল।

এই নিয়ে উটে চাপার এটা আমার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। প্রথমবার জয়পুরের অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর ছিল না। এবারেও প্রথম উটটায় চাপতে গিয়ে সুবিধা হয় না। দ্বিতীয় উটের দুই কুঁজের মাঝখানে আটকে বসি। উট ওঠে। উটের এই ওঠা-বসাটাই সবথেকে মারাত্মক। উটে উঠে নিজেকে সেই লালমোহনবাবুর মতোই লাগে। উটটা কী ভাবছিল কে জানে! তবে ভালো কিছু ভাবেনি নিশ্চিত। কারণ আমি থেকে থেকে উটের সামনের কুঁজ খামচে ধরছিলাম আর বুই বকুনি দিচ্ছিল। উটটার নাকি চোখ দিয়ে জল পড়ছিল বলল আমায় ফেরার সময়। তা দেখিনি তবে সে যে অন্য উটদের গোঁতাচ্ছিল সেটা ঠিক।

যাইহোক, উটের পিঠ থেকে পৃথিবীটা ভারী চমৎকার লাগছিল। দিগন্তবিস্তৃত বালুভূমি। দুপাশে পাহাড়। দূরে গাছপালা। আর আকাশে গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা মেঘ ভিড় করে এসেছে যেন। পাহাড়ের গায়ে মেঘের ছায়া পড়ে ভারী অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। দূরে দিসকিট মনাস্ট্রি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আমার

কাছে মোবাইলটা পর্যন্ত ছিল না, আর থাকলেও ছবি তোলার হাত দুটো তো উটকে আঁকড়ে! মনে হয় শেষপর্যন্ত পিঠ থেকে আমাকে নামাতে পেরে উটটা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল।

বেলা ১১-০০। দিসকিট

দিসকিট মনাস্ট্রি পাহাড়ের অনেকটা ওপরে ধাপে ধাপে উঠে গেছে। দূর থেকে দেখেই আপাতত সন্তুষ্ট হই। এখন আর অত সিঁড়ি ভাঙতে চাইছেনা কেউই। তবে অন্য মনাস্ট্রিগুলোর মতোই এর সম্বন্ধে একটু জানিয়ে রাখি তোমায়। নুব্রা উপত্যকার প্রাচীনতম ও বৃহত্তম এই মনাস্ট্রিটি হলুদ টুপি বা গেলুগপা সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদের অধীনে। চোদ্দ শতকে গেলুগপা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা চাংজেম সেরাব জাংপো, থিকসে গুম্ফার শাখা হিসেবে এই মনাস্ট্রিটির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রার্থনা হলে মুকুট পরা বুদ্ধের (চো রিংপোচে) প্রধান মূর্তি, অন্যান্য বেশ কয়েকটি রক্ষাকারী ক্রুদ্ধ দেবমূর্তি আর একটি বিশালাকৃতি ড্রাম রয়েছে। মনাস্ট্রি চত্বরে একটি এনজিও-চালিত স্কুলও আছে স্থানীয় শিশুদের শিক্ষার জন্য। ফেব্রুয়ারি মাসে মনাস্ট্রিতে হওয়া 'দসমোচে' উৎসবটি স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়।

মনাস্ট্রির ঠিক আগেই আরেকটা পাহাড়ের মাথায় ৩২ মিটার উঁচু বিশাল সোনালি রঙের মৈত্রেয় বুদ্ধের পায়ের নীচে চত্বরটায় দাঁড়িয়ে আছি। রোদ্দুর ঝলমল করছে। ওপর থেকে পুরো ভ্যালির দৃশ্য এককথায় অসাধারণ। যদিও ফেলুদা বলেছে 'অসাধারণ' বললে কিছুই বোঝা যায়না।

জলে পাহাড়ের ছায়া। পরিযায়ী হাঁসেরা ভাসছে। মোবাইলে কিশোর বাজছে, 'দিল কেয়া করে যব কিসিসে কিসিকো প্যার হো যায়...'। এই প্রকৃতির রূপের মধ্যে একটা নিষ্ঠুরতা আছে, তবু ভালোবাসতে ইচ্ছে করে - রুক্ষ পাহাড়, তার গায়ে হলুদ-লাল-সবুজ ঝোপ, কোথাও একটু জলে টলটল করছে প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি।

একই পথে ফিরছি, দৃশ্য তো সব একই। কিন্তু শেষ দুপুরের বিষন্নতার সঙ্গে সকালে নীল-সাদা নদীর জলে রোদের ঝলমলানির পার্থক্য যে অনেক বেশি।

আকাশে আজ অনেক মেঘ - সাদাই বেশি, কখনও বা আবছা কালোয়।

রাস্তা সারাইয়ের কাজ চলছে। পিচের গন্ধ উঠছে। সার দিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে। আমরাও থামি।

দুপুর ১২-৪৫। খালসার

বারোটা নাগাদ খালসার পেরিয়েছি। মেঘলা করে আসছে। রোদ মরে ঠান্ডা বাড়ছে হু হু করে। খালসারেই দুপুরের খাওয়ার পাট মেটানো হল।

দুপুর ২-৩০। নর্থ পুল্লু

একদিকের বরফ পাহাড়ের মাথায় রোদ্দুর ঝলসাচ্ছে। উল্টোদিকের বরফেঢাকা পাহাড় মেঘে মেঘে বিষণ্ন।

পথে অনেক বাইকার দেখলাম। লাদাখের পাহাড়ে এই বাইক ভ্রমণ দিনদিন এখন জনপ্রিয় হচ্ছে। সকাল থেকে অনেকবার ক্লু ম্যাগপাই চোখে পড়ল। গতকাল যাওয়ার সময়ও দেখেছিলাম, তবে অনেক কম। পথে স্থানীয় লোকজন কমই চোখে পড়ছে গতকাল থেকেই।

'আজীব দাস্তাঁ হ্যায় ইয়ে, কাঁহা শুরু কাঁহা খতম...' - লতার মনকেমন করা কণ্ঠস্বরে পাহাড়ি পথ পেরিয়ে যাচ্ছি।

সামনের দুপাশের পাহাড় যেন বরফে ভেসে গেছে।

নর্থ পুল্লু চেকিং পয়েন্ট। খানিক আগেও বরফপাত হয়েছে। পাস বন্ধ। রাস্তা ওয়ান ওয়ে করে দেওয়া হয়েছে। সাউথ পুল্লু থেকে গাড়িরা না এসে পৌঁছালে এপাশ থেকে ছাড়বে না আর্মিরা। কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে!

*ডায়েরির এই অংশে আগে যা যা লেখা হয়নি সেগুলো লিখে রেখেছিলাম। ভ্রমণকাহিনি লিখতে বসে আগের কথা আগেই লিখেছি। শুধু যেটুকু লেখা হয়নি সেটাই বলি।

সেটা গতকাল সকালের একটা মজার ঘটনা। হুন্ডারের জন্য রওনা দেওয়ার ঠিক আগে। আসলে বীরেনকে আপেলে পেয়েছে অথবা আপেল বীরেনকে। হোটেল বিমলার আপেল গাছে অজস্র আপেল দেখে বীরেন কাউকে বলে, না বলে থেকে থেকেই পাড়ছে, কিম্বা ধনগিরিকে দিয়ে পাড়াচ্ছে সবার জন্যই। আমরা বিনা পরিশ্রমে আপেল ডায়েটেই আছি। মানে মোর দ্যান ওয়ান অ্যাপেল আ ডে। যাইহোক, ঘটনাটা বলি এবারে। বীরেন বেরোনোর আগে ধনগিরিকে তিনটে আপেল পাড়তে বলেছিল। মালকিন দেখতে পেয়ে বলল, কুড়ি টাকা লাগবে আপেলের জন্য। ধনগিরি গেল খেপে। বলল, তোমার কত আপেল পাখিতে খেয়ে যায়, কত আপেল পড়ে নষ্ট হয়, আর তুমি তিনটে আপেলের দাম চাইছ? তোমার বাড়িতে

কোনও অতিথি আসবে না। তুমি মানুষ না বনমানুষ? এরপর অবশ্য মালকিনের সঙ্গে টুসির গল্প জমে উঠল। গল্পের তোড়ে কুড়ি টাকা কোথায় ভেসে গেল কে জানে! পরে বীরেনের মুখে পুরো কাহিনিটা শুনলাম। আসলে পাহাড়ি মানুষ এরকমই সরল মনের হন সে বহুবারই দেখেছি।

দুপুর ২-৪৫

উলটো দিক থেকে বেশ কয়েকটা বরফে ঢাকা গাড়ি এল। কিন্তু এখনও এদিক থেকে গাড়ি ছাড়ছে না। ঠান্ডা এত বাড়ছে যে গ্লাভস খুলে ডায়েরি লেখাই খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে।
গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়ছে বাইরে। বিয়াল্লিশ বছরের জীবনে এই প্রথম চোখের সামনে বরফ পড়া দেখে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে। ক্রমশ চারদিক সাদা হয়ে আসছে। গাড়ির মাথাগুলো ঢেকে যাচ্ছে নরম বরফে। যেন কোন রূপকথার রাজ্যে বসে রয়েছি। আর -
শুধুই তুষার ঝরছে, শুধুই তুষার।

পৌনে তিনটে বেজে গেছে ঘড়িতে। এতক্ষণে গাড়ি ছাড়ল। এখনও বরফ পড়েই যাচ্ছে। ওদিকে রোদ্দুরও উঠেছে। বরফের গায়ে গায়ে রোদের ঝলক। পড়তে থাকা বরফ কুচির গায়েও রোদের ঝিকিমিকি। রাস্তার ওপরেও জায়গায় জায়গায় বরফ জমেছে, সেনারা পরিষ্কার করে ফেলছেন জরুরি তৎপরতায়।
একেবারে মাথার ওপরে নীল আকাশে সূর্য। নীচের মেঘ তুলনায় কালচে রঙের। আরও নীচে বরফ পাহাড়ের মাথা যে মেঘ ছুঁয়েছে তার রঙও সাদা। সেই ভয়ানক খারাপ রাস্তাটায় আবার প্রবল ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোচ্ছি।

বিকেল ৩-২৫

পথের পাশেই পাহাড়ের গা মোড়া নরম রোদে। ঝুরো বোল্ডার সরিয়ে রাস্তা সারানোর কাজ চলছে জায়গায় জায়গায়। অনেকটা উপরে উঠে এসেছি, পথের উপর হালকা বরফের আস্তরণ। হঠাৎ আমাদের গাড়ি থমকে দাঁড়াল, সামনে একটা ছোট মালবাহী গাড়ি দাঁড়িয়ে। আমাদের ড্রাইভার তুন্ডুপ বলে উঠল - ফাস গয়া শালা। কী হল জিজ্ঞেস করতে বোঝা গেল, বরফের আস্তরণে রাস্তা এমন পিছল হয়ে আছে যে সামনের গাড়িটার চাকা রাস্তায় গ্রিপ করতে পারছেনা, স্লিপ করে যাচ্ছে। সেটা না সরলে এগোনো যাবে না। ওই গাড়ির হেল্পারের সঙ্গে পথের দু-একজন লোকও গাড়িটা ঠেলতে শুরু করেছে। আমাদের গাড়ি থেকেও কেউ কেউ নেমে ঠেলায় সাহায্য করতে গেল। শক্তি থাকলে ঠেলে দেখতাম হয়তো। কিন্তু একটুও নড়াতেও পারব না জানি এবং শেষে আবার আমাকেই ঠেলতে লোক লাগবে। গাড়িতে বসেই দেখছি আর লিখছি চুপচাপ। আমি আর বুই বাদে সকলেই নিচে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। টুসি গাড়ি ঠেলার মুভি তুলছে হ্যান্ডিক্যামে। কোনওক্রমে ঠেলে ঠেলে কিছুদূর এগোনোর পর গাড়িটা স্টার্ট নিয়ে বেড়িয়ে গেল।
এবার আমাদের গাড়ি এগোল, এবং আগের গাড়িটার জায়গায় গিয়ে আমাদের গাড়িটাও থেমে গেল। তুন্ডুপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ম্যায় ভি ফাস গয়া। তার মানে আমাদের গাড়িও এবার ঠেলতে হচ্ছে!
একটু আগেই দীপের শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। যদিও অক্সিজেন নিচ্ছেনা বারবার বললেও। গাড়ি ঠেলাতেও হাত লাগিয়েছে।
খানিক ঠেলার পর গাড়ি স্টার্ট নিল। সামান্য এগিয়ে বাঁক নিতেই দেখি, আরে আমরা তো এতক্ষণ খারদুং লা-র মুখেই ছিলাম। প্রায় ১৮০০০ ফিট উচ্চতায় টেম্পো ট্র্যাভেলারের মত বড় গাড়ি ঠেলতে পেরে সবাই দারুণ উত্তেজিত!

এখন খারদুং পাসে বরফের পরিমাণ আরও বেশি। খানিকক্ষণ থামার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এমনিই অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাই নেমে একটু পায়চারি করে আবারও দুচারটে ছবি তুলে রওনা দেওয়া হল।

বিকেল ৩-৫০। সাউথ পুল্লু

রাস্তা পুরো বরফে ঢাকা। গাড়ি তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যেতে চাইছে যাতে আর না আটকায়। ঠেলার লোকও মিলবে না এরপর।

সন্ধে ৫-১৫। লেহ

বহুক্ষণ একটা মিলিটারি কনভয়ের পেছন পেছন যেতে হল। তার বেশিটাই আবার কামানের মুখে। মানে সামনেই কামানের গাড়ি। অলিখিত নিয়ম হল, ওরা পাশ না দিলে সিভিলিয়ান কোনও গাড়ি মিলিটারি গাড়িকে ওভারটেক করতে পারবে না। যাত্রার এই অংশটাই ছিল সবচেয়ে ধীর আর বিরক্তিকর। ক্লান্তও লাগছে সকলেরই। তবু কোনও উপায়ই নেই। এইমাত্র ছাড়ল আর গাড়িও গতি নিল। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।
অন্ধকার হয়ে আসছে ক্রমশ। তবে লেহ শহরে ঢুকে গেছি প্রায়।

(ক্রমশ)

আগের পর্ব - প্রথম পত্র

~ *লাদাখের আরও ছবি* ~

'আমাদের ছুটি' আন্তর্জাল ভ্রমণ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক দময়ন্তী দাশগুপ্ত নেশায় লেখক, ভ্রামণিক, ভ্রমণসাহিত্য গবেষক। প্রকাশিত বই - 'অবলা বসুর 'ভ্রমণকথা', 'আমাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত - ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গমহিলাদের ভ্রমণকথা' (সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত)

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

অন্য ভ্রমণ

ভ্রমণ তো বানিয়ে তোলা গল্পকথা নয়, মানুষের সত্যিকারের জীবনকাহিনি। আর তাই ভ্রমণকাহিনি মনে শুধু আনন্দই এনে দেয় না, আনতে পারে চোখে জলও। জাগিয়ে তুলতে পারে জীবনজিজ্ঞাসা, প্রতিবাদের ভাষা। ট্যুরিজম ইন্ড্রাস্ট্রির সহায়ক বিজ্ঞাপনী প্রচারমাধ্যম ছাড়াও ভ্রমণকাহিনির বড় পরিচয় বিশ্ব সাহিত্যের একটি অন্যতম ধারা রূপেও। তেমনই কিছু 'অন্য ভ্রমণ' কথা।

কচ্ছের রান – সীমাহীন ধবলতা ও মনু সাঁইয়া

সোমনাথ ভট্টাচার্য

~ কচ্ছের রানের আরও ছবি ~

আপনি কি মনু সাঁইয়াকে চেনেন? চিনবেনই বা কী করে? আপনি তো কখনো কচ্ছের রানে যাননি। গিয়ে থাকলেও সাম-ই-শারদ-এ থাকেননি। থেকে থাকলেও, আপনার থাকার দু-দিন আগে তো সেখানে বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে যায়নি!

এসব শর্ত না মেনে আপনি যদি ভুজ শহর থেকে জাতীয় সড়ক-৩৪১ নামের যে রাস্তাটা সোজা উত্তর দিকে চলে গিয়েছে সেটা ধরে চলতে থাকেন তাহলেও ভিরান্ডিরা হয়ে, খাওরা (খাবরা) গঞ্জ ছাড়িয়ে দশ-বারো কিলোমিটার গেলে আপনি পৌঁছে যাবেন রানের তীরে। তবে সাবধান, যদি আপনি ভুজ শহরের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দপ্তর থেকে অনুমতিপত্র সংগ্রহ না করে আনেন তবে আপনাকে চেকপোস্টের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে বৃহৎ রানের ধবলতা আর অসীমতাকে উপভোগ করতে হবে, খুব কাছে যেতে পারবেন না, লবণে হাত দিতে পারবেন না। আপনার দেখাটা হবে পাঁচিলের বাইরে থেকে তাজমহল দেখার মতো। অথবা, হরিদ্বার থেকে হিমালয় দেখার মতো। আপনি যা দেখবেন সেটা কি নিস্তরঙ্গ জলরাশি? নাকি ভেজা বরফ? নাকি শুধু লবণ আর লবণ? সে ব্যাপারে বই-এ পড়া, কানে শোনা বিদ্যে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আর আপনি যদি অনুমতি নিয়ে যান তবে ওরা আপনাকে ওই রাস্তা ধরেই এগিয়ে যেতে দেবে রানের গভীরে 'ইন্ডিয়া ব্রিজ' পর্যন্ত। তখন আপনি রানের প্রকৃত স্বাদ পাবেন। রাস্তাটা অবশ্য ওখানে শেষ হবেনা, চলে যাবে রানের বুক চিরে পাকিস্তান সীমান্ত অবধি। আপনি যেহেতু অসামরিক ব্যক্তি, তাই আপনাকে আর এগোতে দেওয়া হবে না।

আর যেতে পারেন কালো ডুঙ্গারে এবং সেখানকার একান্ত নিজস্ব দৈনন্দিন ঘটনাটি চাক্ষুষ করতে পারেন। সেখানে যাওয়ার পথ গিয়েছে খাওরা থেকে পূর্ব দিকে। শেষ বিকেলে ওখানে গিয়ে পৌঁছোবেন। কালো ডুঙ্গার হল একটা বড় টিলা। গায়ে যথেষ্ট ছোট গাছ আর ঝোপ আছে বলে কম আলোয় এটাকে কালো দেখায়। তারই গা বেয়ে গাড়ি করেই ওপরে উঠে পৌঁছে যাবেন দত্তাত্রেয়র মন্দিরে। সেখানে আপনাদের মধ্যে কেউ পুজো দেবেন, কেউ প্রণামী দেবেন, কেউ শুধুই প্রণাম করবেন। আর, যিনি এসব কিছুই করবেন না তাঁর জন্য, এবং অবশ্যই সবার জন্যই বরাদ্দ থাকবে সেই ঘটনাটি। (লোক-মতে) দেবতা দত্তাত্রেয় শিবা-রূপ ধারণ করে তাঁর পূজার উপচার গ্রহণ করবেন। তবে মন্দিরে এসে নয়, মন্দির থেকে অনেকটা দূরে, জঙ্গলের কাছে একটা বেদির ওপরে দত্তাত্রেয়র প্রসাদী ভাত রেখে দিয়ে থালা বাজানো হবে। একটু পরে কয়েকটা শিয়াল এসে সেই ভাত খেয়ে যাবে। টিলার ওপর থেকে দেখবেন রানের দৃশ্যও। পাহাড়ের পাদদেশে, রানের উপকূলে অগভীর জমা-জলের মধ্যে কয়েকটা সারস, ফ্লেমিংগো, পেলিকান আর বাস্টার্ডও দেখতে পাবেন। কিন্তু মনু সাঁইয়াকে পাবেন না।

খাওরা চেকপোস্ট

* * *

আর যদি ভিরান্ডিরা থেকে বাঁদিকে মোড় নেন তবে বারো-তেরো কিলোমিটার গেলে পৌঁছে যাবেন সাম-ই-শারদ-এ। 'সাম-ই-শারদ' কথাটার বাংলা মানে হল 'সীমান্তে সূর্যাস্ত'। এটা একটা ভিলেজ রিসর্ট বা গ্রামীণ অতিথিশালা। এটাকে ভিলেজ রিসর্ট বলার একাধিক কারণ থাকতে পারে: প্রথমত, হোড়কা গ্রামের মধ্যে না হলেও তার পরিসীমার মধ্যে এটা অবস্থিত; দ্বিতীয়ত, হোড়কার গ্রাম কমিটির দ্বারা এটা পরিচালিত; আর শেষত, এটা মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা নকল গ্রাম। যাঁরা মাটির পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি দেখেননি তাঁরা 'পথের পাঁচালি', 'অপরাজিত', বা অন্য কোনও সাদা-কালো বাংলা সিনেমা দেখে নিতে পারেন।

বাংলার গ্রামের সঙ্গে এই পাঁচিলের যে অমিল পাবেন তা হল, বাংলার পাঁচিলগুলো হল মোটা মাটির দেওয়াল - তার মাথায় খড়ের আচ্ছাদন থাকে। আর এখানে, কচ্ছে, সরু-মোটা ডালপালার বেড়ার ওপরে মাটি লেপা, ডালপালাগুলো মাটির আড়ালে নিজেদের অস্তিত্ব গোপন করতে নারাজ, তাই মাথা উঁচিয়ে থাকবে। আর, মিল পাবেন পাঁচিলের গায়ে ছোটো, নিচু সদর দরজাটায়, যার মাথাতে খড় বা ঘাসের ছাউনি থাকবে। দরজার কাছে দুটো বৃক্ষ কচ্ছের বিরল দৃশ্য তার ছায়ায় দুটো গরু বাঁধা থাকবে। দরজা পেরিয়ে ঢোকার পর আপনি যে আতিথেয়তা পাবেন তা 'এয়ার ইন্ডিয়ার মহারাজা'-র তুলনায় অনেক অদক্ষ, অনেক সাদামাটা, কিন্তু অনেক আন্তরিক। এর পরে একটা বৈঠকখানা এবং খোলামেলা খাওয়ার মণ্ডপ। পাঁচিল-ঘেরা অঞ্চলটার মধ্যে অনেকগুলি খড়ে ছাওয়া, মাটির দেওয়ালের গোলাকার কুটির (যেগুলোকে স্থানীয় ভাষায় ভুঙ্গা বলে)। বাইরের চেহারাটা গ্রাম্য হলেও ভিতরটা বিলাসবহুল। আপনি সেগুলিতে থাকবেন না। কুটিরগুলিকে ডানদিকে রেখে বাঁয়ে এগিয়ে যাবেন। আপনার বাঁপাশে একটা সৃজিত বনে দুটো গাধা ঘুরে বেড়াবে। এরই শেষে এই গ্রাম্য পরিবেশের নকল দিকটাকে প্রকট করে তুলেছে যে তাঁবুগুলি তারই কোনোটাতে আপনি থাকবেন।

সাম-ই-শারদ ভিলেজ রিসর্টের কটেজ

স্নানাদি সেরে খাওয়ার উদ্দেশ্যে আপনি যখন বৈঠকখানা তথা খাওয়ার মণ্ডপে পৌঁছোবেন তখন দেখবেন সেখানে গানের আসর বসেছে। মেঝেতে পাতা গালিচায় বসে একজন তানপুরা বাজিয়ে গান করছেন, চারজন যন্ত্রানুসঙ্গী। সবাই কচ্ছের ভূমিপুত্র, মালকোঁচা মারা ধুতি, সাদা লম্বা ফুল-শার্ট, মাথায় রঙিন কাপড়ের পাগড়ি। কেউ কিছু বলবে না, আপনি নিজের থেকেই গিয়ে বসবেন গায়কদের সামনের অথবা পাশের মাটির বেদিতে বেঞ্চে বসার মতো করে পা ঝুলিয়ে, বা পা গুটিয়ে আসন-পিঁড়ি হয়ে। গুজরাটি বা মারাঠি যে সব যাত্রীরা আপনার আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়ে থাকবেন তাদের কেউ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াবেন। হাত দুটো সামান্য ওপরে তুলে তুড়ি দেবেন গানের তালে তালে। কোমর থেকে ওপরের অংশটা দুলতে থাকবে একই তালে। তারপর পা দুটোও। তিনি অবশ্যই যৌবনোত্তীর্ণ একজন পুরুষ। তারপর আরও একজন। তারও পরে কোনো মহিলা, এবং শেষে যুবক-যুবতীরা। তাদের নৃত্যের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়বে আপনারও মনে। আপনি বসে বসে তুড়ি বা তালি দেবেন। কম্পন অনুভব করবেন পায়ের পেশীতে, শিরদাঁড়ায় এবং মস্তিষ্কে। কিন্তু, সামাজিক নৃত্যবিরোধী বাঙালি সংস্কার কাটিয়ে সেই উৎসবে যোগ দিতে পারবেন না; দর্শক হয়েই থাকবেন। সকলের মাঝে বসে নিজের মুদ্রাদোষে নিজেই একা হবেন।

সন্ধ্যার পরে বৈঠকখানাতে একে একে এসে জমা হবেন কিছু বয়স্ক মানুষ। প্রায় সবারই পরনে সাদা ধুতি-শার্ট; মাথায় রঙিন বা সাদা পাগড়ি অথবা টুপি। কারও হাতে লাঠি। কারও মোটা গোঁফ, শেষপ্রান্ত পাকানো। কেউ বা প্যান্ট-শার্ট পরিহিত। এঁরা হোড়কা গ্রামের বরিষ্ঠ নাগরিক। তাঁরা নিজেদের মধ্যে গল্প করবেন। আপনি যদি আলাপী ও অনুসন্ধিৎসু হন, তবে ওঁদের আড্ডায় যোগ দেবেন।

লোকগীতির আসর সাম-ই-শারদে

ওদের কাছ থেকে জানতে পারবেন, কচ্ছের পশ্চিমদিকের এই অঞ্চলটা আগে রানেরই অংশ ছিল। উত্তরবাহী বর্ষা-জলের নদীগুলির পলি জমে জমে জলকষ্টসহিষ্ণু মানুষগুলির বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। এখানে পানীয় জলের বড় অভাব। বাংলা 'গ্রাম' শব্দটার কচ্ছীয় প্রতিশব্দ হল 'ঝিল' যার বুৎপত্তিগত অর্থ 'যেখানে খাবার জল পাওয়া যায়'।

ওঁরা আবহাওয়ার কথা বলবেন, জিনিস-পত্রের দামের কথা বলবেন, রানের কথাও বলবেন। "বড় অদ্ভুত জায়গা, চির-অচেনা। একটা বিশাল শূন্যতা। যান না, গিয়ে দেখবেন।"

"রানের ওপারেই তো পাকিস্তান। তাই না?" আপনি জিজ্ঞেস করবেন। সবাই সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়বেন।

"গিয়েছেন কখনও কেউ?" আবার আপনার প্রশ্ন। এবারে সবাই চুপচাপ।

"ও-কথা জিজ্ঞেস করবেন না কখনও।" একজন বলবেন।

"কেন?"

"ওটা বেআইনি। মিলিটারি দেখতে পেলে গুলি করে মেরে দেবে, না-হয় তো জেলে পুরে দেবে। গিয়ে থাকলেও আপনাকে কেউ বলবে না।"

"আপনারা বোধহয় রানে পৌঁছোতে পারবেন না।" ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গ পালটান কোনো একজন।

"কেন?" আপনি প্রশ্ন করবেন।

"দু-দিন আগে খুব বৃষ্টি হয়েছে, জলে-কাদায় আপনাদের গাড়ি চলতে পারবে না।"

আপনার হতাশ চোখকে নজর করে কেউ একজন বলে উঠবেন, "যাক না। চেষ্টা করেই দেখুক।" তিনি আরও বুঝিয়ে বলবেন,"থোরডো পৌঁছে দেখবেন এখানকার মতো একটা অতিথিশালা আছে, সেখানে খোঁজখবর

সাম-ই-শারদের ডাইনিং হল

নিলে জানতে পারবেন পথ কেমন আছে।"
রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বরিষ্ঠরা দু-তিন জন করে আসরত্যাগ করবেন। যিনি বেশি কথা বলছিলেন তাঁকে এগিয়ে দেওয়ার অজুহাতে আপনি তাঁর সঙ্গ নেবেন। আপনার উদ্দেশ্য সফল হবে। এক সময়ে তিনি দাঁড়িয়ে পড়বেন। বলতে থাকবেন, "যুবক বয়সে আমি অনেকবার রান পেরিয়েছি। এখন শুধুমাত্র ড্রাগ আর অস্ত্রের চোরাকারবারিরাই ওখানে যায়। মিলিটারির লোকেরা এই ব্যবসা বন্ধের জন্য খুব চেষ্টা করছে।" তিনি শির বেরকরা হাতের পাঞ্জাটা নাড়িয়ে বলবেন "কিন্তু ওরা কী করে পারবে? রান কী একটুখানি জায়গা? ওরা সব জায়গায় যেতেই পারে না। কোনো কোনো জায়গায় শুখার সময়েও ওদের জিপ বা ট্রাকের চাকা কাদায় আটকে যায়। রানকে কেউ চিনে উঠতে পারে না। এক-এক বছরে ওর এক-এক রূপ।" সামনের অন্ধকার প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে তিনি একটু বেশি সময় ধরে নীরব থাকবেন। তারপর আবার বলতে শুরু করবেন। তাঁর গলার স্বর বিষাদময়। "অনেক বছর আগে আমি আমার ভাইকে হারিয়েছি, ওর নিজের উটটাকেও। ও আমার মতো অভিজ্ঞ ছিল না। আমার কথা শুনল না। বলেছিলাম, এ-বছর বর্ষা দেরিতে শেষ হয়েছে, তোমাকে ঘুরপথে যেতে হবে। শুনল না। ওর তাড়া ছিল। ওরা গরিব ছিল ...।" বিষাদের হাসি ফুটে উঠবে তাঁর গালের রেখায়। "আমরা সবাই গরিব, কিন্তু ও চাইছিল জমি কিনে কোঠা বাড়ি করবে। ... ওর বড় তাড়া ছিল।" আবার একটা দীর্ঘ নীরবতা। আবার অদৃশ্য দিগন্তের দিকে শূন্য দৃষ্টিপাত। "বড় ভালো ছেলে ছিল। আমি তার বড় ভাই। ওর আমার কথা শোনা উচিত ছিল।" তিনি আবার চুপ করবেন।
"কী হল তার?" বোকার মতো প্রশ্ন করবেন আপনি।
"ওর ছেলেটাও ছিল ওর সঙ্গে। বারো বছর বয়েস। ফুটফুটে, তরতাজা একটা ছেলে ..."
ভিতর থেকে দুঃখের বাষ্প ঠেলে বেরিয়ে এসে আবার তাঁকে বাকরুদ্ধ করবে। "ও অন্যপথে গেল।" ভিতরের বাষ্পটা একটা দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে আসবে। তিনি মুখ তুলবেন। সাম-ই-শারদ-এর ইলেকট্রিকের আলোর একটা টুকরো এসে পড়বে তাঁর মুখে। আপনার মনে হবে এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি আরও বেশি বুড়ো হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু, আপনি তখন সাংবাদিকদের মতো নাছোড়বান্দা।
"কী হল তাদের?"
"ও পথ হারিয়ে ফেলেছিল। আমরা ফেরার পথে ওদের দুখানা উটকে দেখতে পেয়েছিলাম। সেগুলো প্রায় মরতে বসেছিল। আমরা ও দুটোকে গ্রামে ফিরিয়ে এনেছিলাম।"
"ও হয়তো অন্য পাড়ে পৌঁছে গিয়েছে। কোনো এক দিন ফিরে আসবে।"
"এখানে ওর বউ আছে, অন্য বাচ্চারা আছে।"
"হয়তো মিলিটারির লোকেরা ওকে অ্যারেস্ট করেছে।"
"নাঃ - এ-সব আঠাশ বছর আগের কথা। তখন এখানে এত মিলিটারি ছিল না।"
"তাহলে উনি মারাই গিয়েছেন?"
ভদ্রলোক তাঁর লাঠির মাথার ওপরে রাখা হাতদুটোর দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকবেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর মাথা তুলে বলবেন, "ও 'সফেদ' হয়ে গিয়েছে।"
"সফেদ?"
"যারা রান থেকে ফেরে না, তাদের আত্মার একটা অংশ রানে থেকে যায় 'সফেদ' হয়ে। এই বিশাল রানে এ-রকম অনেক আছে। কে জানে কত! শত-শত মানুষ, শত-শত 'সফেদ'। যে অংশটা গ্রামে ফিরে আসে তাকে আমরা প্রেত বলি। তাকে ভয় পাই। কিন্তু 'সফেদ'দের আমরা ভয় পাইনা। আমরা যখন রান পেরিয়ে যাই তখন ওঁদের স্মরণ করি। ওঁরা আমাদের রক্ষা করেন, পথ চেনায়।"
"কিন্তু আপনি তো কখনো তাঁদের দেখেননি।"
"তোমাকে তো আগেই বলেছি, বড় অদ্ভুত জায়গা এই রান। এখানে অদ্ভুত সব ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় ব্যাখ্যা করা কঠিন। পৃথিবীতে আর কারো সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাবে না, এমনকী অন্য সব মরুভূমির সঙ্গেও। এর স্বভাব আলাদা, ভাষা আলাদা। তার কথা তুমি যদি মন দিয়ে শোন, তাকে ভালো করে দেখ, তাহলে তুমি নিরাপদ থাকবে ...।"
"আপনার ভাই সে-সব মন দিয়ে শোনেনি?"
"ও খুব ভালো লোক ছিল। কিন্তু অল্প বয়স। খুব দুশ্চিন্তায় ছিল। অনেকরকম সমস্যায় মাথাটা ভরা ছিল। তাই ও সব কিছু ভালো করে শুনতে পায়নি।"
"আপনার সব সময়ে তার কথা মনে পরে, তাই না?"
"সে আমার একমাত্র ভাই ছিল। আমার পাঁচটা বোন আছে। কিন্তু ও ছিল আমার একমাত্র ভাই।"
"তাহলে আপনার মনে হয়, সে এখনও এখানে আছে?"
"অবশ্যই। ও সফেদ হয়ে গেছে। ও এখানে চিরকাল থাকবে।"

* * *

আপনি এখানে আসার আগে ইন্টারনেটে রানের ছবি দেখেছেন। ঘন নীল আকাশপটে পূর্ণিমা-চাঁদ, আর সেই নীলিমা ছড়িয়ে পড়েছে ধবল সমভূমিতে, আর কিছু নয়, একটাও গাছ নয়, ঘাস নয়, এক টুকরো মেঘ নয় এই হল রান। সেই ছবি পেতে হলে আপনাকে রান উৎসবের সময়েই আসতে হত। অন্য সময়ে কাউকে রাতের বেলা রানের মধ্যে থাকতে দেওয়া হয় না। তবু, কাজু বাদামের অভাবে চিনে বাদাম দিয়ে রসনা তৃপ্ত করার বাসনায় রাতের খাবারের পর আপনি এবং আপনার সঙ্গীরা বেরিয়ে পড়বেন পাঁচিলের বাইরে। শুক্লা অষ্টমীর চাঁদ অস্ত যেতে তখনও ঘণ্টা দুয়েক দেরি। চেয়ারে পিঠ বাঁকিয়ে আধশোয়া অবস্থায় আকাশের দিকে তাকিয়ে সে আসন্ন ছুটির প্রহর গুনছে। মুখে কর্মদিবস-অবসানের খুশির হাসি। তার অর্ধতনু থেকে প্রতিফলিত সূর্যালোক হোড়কার প্রান্তরে একটা স্বপ্নালু আবছায়া সৃষ্টি করবে। দিগন্তবিস্তৃত ফাঁকা মাঠে গাছ পাবেন ওই রিসর্টটায় আর দূরে পাকা রাস্তার ওপারে একটা জায়গায় কয়েকটা। পায়ের নিচের সমতল প্রান্তরটার কালো রঙের মাটি সাদা-বালির চরের মতো জমাট অথচ নরম। বেশ কিছু দূরে দূরে এক থেকে পাঁচ-ছয় ইঞ্চি লম্বা অচেনা কোনো চারাগাছ বা গুল্ম। সেই ফাঁকা মাঠে আপনাদের পরস্পরের কথাগুলিকে মনে হবে দূর থেকে ভেসে-আসা শব্দ। আপনারা এদিক ওদিক ঘুরবেন। হঠাৎই সেই জ্যোৎস্নানিশির নিসর্গশোভা উপভোগের প্রতিবন্ধক হিসেবে আপনাদের মনে একটা ভয় জাগবে। সাপ, বিছে বা অজানা কোনো পোকামাকড়ের ভয়। আপনারা সাবধানে পা ফেলে আস্তানায় ফিরবেন।

সকাল বেলায় স্নানাদি সেরে, নাস্তা খেয়ে, অতিথি নিবাসের পাওনা মিটিয়ে, আপনাদের মালপত্র গাড়িতে তুলে, মনে সংশয় নিয়ে রওনা হবেন হোয়াইট রান দেখতে। সাম-ই-শারদ থেকে বেরিয়ে পাকা রাস্তায় পড়ে আপনাদের গাড়ি ডানদিকে ঘুরে যাবে। মসৃণ পথের দু-ধারে ছাড়া-ছাড়া কাঁটা ঝোপ - সম্ভবত বাবলা কাঁটা। কোনো কোনো জায়গায় তাও নেই - দুধারে শুধু ধু ধু মাঠ। লালচে কালো মাটি। ছড়ানো-ছিটানো গোছা-গোছা ঘাসের আকারের কিছু গুল্ম। হঠাৎ-হঠাৎ দু-একটা ক্ষেত। কিন্তু গ্রাম কোথায়? সবুজ ক্ষেতের ওপারে তাল-নারকেল-সুপারি বা আম-কাঁঠালের বাগান দেখে গ্রাম চেনার বাঙালি-চোখে আপনি কোনো গ্রাম খুঁজে পাবেন না। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা গ্রাম চেনার গুজরাটি, কচ্ছীয় চোখ চাই। পাকা রাস্তা থেকে মেটে রাস্তা বেরিয়েছে মাঝে মাঝে - গ্রামের অস্তিত্বের অভিজ্ঞান। সরল-সিধে রাস্তায় কখনো দু-মিনিট, কখনো পনেরো মিনিট বাদে এক-একটা গাড়ির দেখা পাবেন। কদাচিৎ দু-একজন মেয়ে বা পুরুষ গরিব মানুষের দেখা পাবেন মাথায় কাঠ-কুটোর বোঝা অথবা ছাগল চরাচ্ছে। লম্বা-বাঁকা শিং-ওয়ালা গরুর পাল কখনও আপনাদের পথ জুড়ে দাঁড়াবে; আবার, বাঁয়ে-ডাইনে সরে গিয়ে আপনাদের এগিয়ে চলার অনুমতি দেবে। কিছু দূরে দূরে লেখা দেখবেন এটিএম ২৫, ২০ বা ৫ কিলোমিটার দূরে। আর পাবেন থোরডো যেতে কতটা পথ বাকি সেটা জানিয়ে দেওয়ার কিলোমিটার ফলক। এমনই চলতে চলতে এক সময়ে দেখবেন বেশ কিছু বৃক্ষ, কয়েকটা বাড়ি - কোনোটা গোল, কোনোটা চৌকো। গোল ঘরগুলোর মাথাটা পাতায় ছাওয়া, শঙ্কু আকৃতির। চৌকো বা আয়তাকার ঘরগুলোর কোনো-কোনোটার মাথায় ঢালাই-ছাত, কোনোটা দোচালা, কোনোটা পিরামিড-ধরনের চার-চালা। এরই মধ্যে একটা হল একটা ব্যাঙ্ক - স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। তার

কালো ডুঙ্গার যাওয়ার পথে

লাগোয়া এটিএম। একটা দোকান - না চায়ের দোকান নয়, ভুজিয়ার দোকানও নয়। বিড়ি-সিগারেট, বিস্কুট-লজেন্স, সাবান আর মুদির সামগ্রী কিছু। এটাই বাসস্ট্যান্ড। ভুজ থেকে সারাদিনে একটা বাস আসে, আবার ফিরে যায়। গাড়ি থেকে নেমে আপনার সঙ্গীরা কেউ হয়তো এটিএম থেকে টাকা তুলবে, কেউ সিগারেট কিনবে। তারপর আবার এগিয়ে চলবেন।

কিলোমিটারখানেক চলার পর দেখবেন একটা পাঁচিল ঘেরা জায়গার মধ্যে কয়েকটা ডুঙ্গা যেমন দেখেছেন একটু আগে। সেটা ছাড়িয়ে একটু যেতেই রাস্তাটা মিশেছে আর একটা পাকা রাস্তার সঙ্গে - ইংরেজি T অক্ষরের মতো করে। সেখানে দাঁড়িয়ে সামনে বাঁ দিকে দেখবেন সারি সারি অনেক তাঁবু, পিছনে দেখা যাবে ফেলে আসা পাঁচিল-বন্দি ঘরগুলোকে। ওটাই কি সেই গ্রামীণ অতিথিশালা? না কি তাঁবুগুলো? কোন দিকে সফেদ রান? কাকে জিজ্ঞেস করবেন? লোক কোথায়? অন্য গাড়িও নেই একটাও। আপনাদের গাড়িটা যেহেতু ভুজের বদলে আমেদাবাদ থেকে নেওয়া তাই তার ড্রাইভার আপনাকে কোনো দিশা দেখাতে পারবেন না। কাজেই সমাধানের আশায় আপনারা তাঁবুগুলোর দিকেই এগোবেন। সেখানে দুই সারি তাঁবুর মাঝখানের পথের মতো জায়গাটায় তিনজন লোক দেখতে পাবেন - মাত্র তিনজনকে। রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে, তাই গাড়ি থেকে নেমে আপনারা এগিয়ে যাবেন তাদের দিকে। দু-জন ছুতোর মিস্তিরি - প্যান্ট আর গেঞ্জিপরা, তাঁবুগুলোর ভিতরের অঙ্গশয্যার কাজে রত। তৃতীয়জন কচ্ছের ভূমিপুত্র। দীর্ঘদেহী, মাঝবয়সী লোক। পরনে সেই কচ্ছের জাতীয় পোশাক – একটু উঁচু করে পরা মালকোঁচা-মারা ধুতি, সাদা লম্বা ফুল শার্ট, হেড অফিসের বড়বাবুর মত খোঁচা গোঁফ, মাথায় ভাঁজ-করা হনুমান-টুপি। গুজরাটের প্যাটেলদের সম্পর্কে একটা রটনা আছে, তারা নাকি এক সেট পোশাক পরতে শুরু করলে ছেঁড়ার আগে পর্যন্ত সেটা পালটায় না। কচ্ছের লোকদের ক্ষেত্রেও সেটা যদি সত্যি হয় তবে আপনি নিশ্চিত হবেন যে এই লোকটার পোশাক বদল করা হয়েছে মাত্র মাসখানেক আগে।

কালো ডুঙ্গারের উপর থেকে

উটের রথ

আপনি ওদের কাছে রানে যাওয়ার পথ আর তার সম্ভাব্য গম্যতা সম্পর্কে জানতে চাইবেন। মিস্তিরিদের একজন জানাবে রাস্তায় কাদা হয়ে আছে, আগের দিনই একটা গাড়ি আটকে গিয়েছিল। আপনি জানতে চাইবেন "হেঁটে যাওয়া যাবে না?" ওদের একজন হয়তো বলবে, "অনেকটা পথ।" আর একজন আশ্বাস দেবে, "কেন পারবেন না?" ওরা নিজেদের মধ্যে হিন্দিতে যে কথাবার্তা চালাবে তার থেকে বোঝা যাবে - সরপঞ্চের একটা উটে টানা গাড়ি আছে, ট্যুরিস্টদের রানে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেটা ভাড়া দেওয়া হয়। সরপঞ্চের বাড়ি দু-কিলোমিটার দূরে। সাদা পোশাকের লোকটা জানাবে - সরপঞ্চ সম্ভবত ভুজে গিয়েছে নিজের কাজে, তার গাড়ি পাওয়া যাবে না। শেষ পর্যন্ত ওরা চেকপোস্ট পর্যন্ত যাওয়ার পরামর্শ দেবে; সেখান থেকে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। এই প্রস্তাবে সাদা পোশাকের লোকটির উৎসাহ দেখে আপনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন সে আপনাদের সঙ্গে যেতে রাজি আছে কিনা। লোকটি তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানাবে। যেতে যেতে অবশ্য সে বলতে থাকবে - তার বাড়িতে অনেক কাজ আছে, সে থাকগে, বিদেশি বাবুদের সাহায্য করাটাও মহৎ কাজ ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি তার নাম জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন সে-ই 'মনু সাঁইয়া'।

আপনাদের গাড়িটা মাথা ঘুরিয়ে, থোরডো থেকে যে রাস্তায় আপনারা এসেছিলেন সেটাকে ডাইনে ফেলে রেখে সোজা এগিয়ে চলবে। ধু-ধু মাঠের মধ্য দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনারা পৌঁছে যাবেন চেকপোস্টে। এখানেই পাকা রাস্তা শেষ। চেকপোস্ট মানে একটা ছোট ঘর - ইঁটের দেওয়াল, মাথায় পলিথিনের চাল - এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দু-জন বন্দুকধারী জওয়ান। তারা আপনাদের প্রত্যেকের পরিচয়পত্র দেখতে চাইবে, কোথা থেকে এসেছেন জানতে চাইবে। ব্যস, এইটুকু। মনু সাঁইয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য সেসব লাগবে না। স্থানীয় লোক বলে কথা।

পাকা রাস্তা এখানেই শেষ, কিন্তু রাস্তা এখানে শেষ নয়। দু-পাশের মাঠের থেকে এক-দেড় ফুট উঁচু করে চিহ্নিত মাটির রাস্তা এগিয়ে গিয়েছে অনেক দূর পর্যন্ত, একই সরল রেখায়। ইলেকট্রিকের খুঁটিগুলিও পথের আরও একটা নিশানা। বৃষ্টি-ভেজা আলগা মাটি গাড়ির চাকার চাপে কাদা হয়ে থাকবে। গাড়ি নিয়ে ওই পথে চলতে গিয়ে কেউ একজন কাদার বাঁধনে আটকা পড়েছিল গতকালই, সে কথা আপনার জানা হয়ে গেছে। তবে মাঠের মাটি চাপসহ। দেখেশুনে চললে সেখান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এগিয়ে চলা যায়। কিন্তু, আপনাদের ড্রাইভার নিজেই গাড়ির মালিক, তাই অতি

সাবধানী। তিনি কিছুতেই রাজি হবেন না। কাজেই হেঁটেই এগোতে হবে। মনু সাঁইয়া যখন সঙ্গে আছে, তখন আর ভয় কী?

পাকা রাস্তার শেষে

পথের নির্দেশ তো পড়েই আছে। তাকে বাঁ দিকে রেখে ভেজা কিন্তু শক্ত মাটির ওপর দিয়ে পথ চলা। মনু সাঁইয়া ছাড়বে কেন? তার দায়িত্ব সে অবহেলা করতে রাজি নয়। মাঝে মাঝেই বলবে, 'ও-দিকে নয়, এ-দিক দিয়ে চলুন।' পূর্ব, পশ্চিম আর উত্তর দিকে হাত দেখিয়ে বার বার বলবে, 'ইয়ে পুরি রন হ্যায়।' আরও বলবে রাস্তার জন্য বরাদ্দ এক কোটি টাকা কীভাবে সামান্য ওইটুকু মাটি ফেলেই গায়েব হয়ে গেছে। মনু সাঁইয়াকে ছাড়াই আপনারা দিব্যি চলতে পারতেন। তবু মনু সাঁইয়া ভরসা। শুধু কি তাই? গাইড বিষয়টাই বেড়ানোর একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আপনি কোনো পুরোনো মন্দির, মসজিদ, প্রাসাদ, দূর্গ দেখতে যান নিজে নিজে বোর্ডের লেখা দেখে দেখে চলতে পারেন, আগে থেকে কারও লেখা পড়ে একটা ধারণা করে আসতে পারেন সে-সব হবে শিক্ষালাভ, আপনার দ্রষ্টব্যটি হবে পাঠ্যপুস্তকের পাতা। আর, গাইড নিন তিনি খাজুরাহোর ট্রেনিং নেওয়া গাইড হোক বা মুর্শিদাবাদের কাটারা মসজিদের সামনে বসে-থাকা চতুর্থশ্রেণি-পর্যন্ত-পড়া বৃদ্ধটিই হোক তারা আপনাকে অনেক কিছু দেখিয়ে দেবে যা আপনার অদক্ষ চোখে ধরা পড়ত না; তারা অনেক কিছু বলবে যা কল্পকাহিনি, অনৈতিহাসিক লোককথা, তবু এক সময়ে মনে হবে গাইড নয়, গল্প বলছে মূর্তিগুলি, প্রাসাদের দেওয়ালগুলি। নির্বাক চিত্রগুলি সবাক চলচ্চিত্র হয়ে উঠছে। গাইড যেন কবিতার গায়ে সুর। মনু সাঁইয়ার কথাগুলি সেই জনহীন প্রান্তরকে বাঙ্ময় করে তুলবে।

কচ্ছের রানে

ধূসর নেড়া মাঠে ধূলিকণাহীন আকাশ ভেদ-করে-আসা শেষ-শীতের সকালের রোদ্দুরও কারও কারও কাছে চড়া মনে হবে। মাঝে মাঝে ঘাসের উচ্চতার গাছ, এদের কোনোটার নাম নুনিপানি - মৌরি-লজেন্সের আকৃতির ছোটো সবুজ ফল তার, সামান্য টক স্বাদ। দু-একটা চড়াই আর শালিখের মাপের পুরোটা ধূসর রঙের লেজ-লম্বা কোনও পাখি। চলতে চলতে এক সময়ে দেখবেন সামনে একটু বেশি কাদা; আর তার ওপারেই আপনার তিন-হাজার-কিলোমিটার-দূর-থেকে-বয়ে-আনা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবতা, কৈশোর-থেকে-বয়ে-বেড়ানো ম্যাপবইয়ের পাতায় বিন্দু-বিন্দু-দিয়ে-চিহ্নিত রহস্যের উন্মোচন কচ্ছের রান, গ্রেটার রান, হোয়াইট রান। মনু সাঁইয়ার নির্দেশে সেখান থেকে সাবধানে চলে বাঁ দিকের রাস্তাটায় উঠবেন, সেখানে কাদা কম। দু-এক মিনিট। কাদা শেষ, মাটি শেষ, রাস্তা শেষ, ইলেক্ট্রিকের খুঁটি শেষ - শুধুই লবণ, লবণের প্রান্তর, লবণের সাগর। আপনি পা দেবেন লবণে। শক্ত - বরফের মতো শক্ত। আপনি এগিয়ে চলবেন। আপনারা এগিয়ে চলবেন। দু-দিন আগের বৃষ্টির জল তখনও শুকোয়নি। কোথাও জুতোর সোল-ভেজানো জল, কোথাও শুকনো। জল বাঁচিয়ে বা না-বাঁচিয়ে আপনার এগোবেন। এগোতে থাকবেন। চারদিকে শুধুই সাদা লবণ। কাছে কোনও কোনও জায়গায় মানুষের পায়ের চাপে বা গাড়ির চাকার চাপে নিচের কাদা উঠে এসে হালকা কালো বা মেরুন ছোপ তৈরি করেছে। দূরে কেবলই ধবলতা। আপনারা কয়েকজন ছাড়া কোনও প্রাণের অস্তিত্ব নেই কোথাও কোনও পাখি নয়, পোকা নয়, ঘাস নয়, মরু-গুল্ম নয়, শেওলা নয়। এক-এক জায়গার হলুদ আস্তরণটা হয়তো কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল। আপনারা পিছু ফিরবেন। দূরে চেক-পোস্টটা ঝুলনের খেলনার মতো চোখে পড়বে। কাছে কাদার অঞ্চলটা শ্বেত-সাগর আর ধূসর মাটির মধ্যে কালো বিভাজিকা হয়ে পড়ে আছে বলে মনে হবে। মাঠের ঘাস-সম চারা-গাছগুলিকে আলাদা করে চেনা যাবে না। আপনার গা ছমছম করবে। এই অনুভূতিটা আরও অনুভব করার জন্য আপনি লবণ-মরুর মধ্যে আরও এগোতে চাইবেন। আপনারা সঙ্গীরা বাধা দেবে। মনু সাঁইয়াও বারণ করবে। 'ইয়ে পুরি রন হ্যায়' হাতটাকে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে সে বলবে। 'ইধার পাকিস্তান হ্যায়, উধার রাজস্থান।' সাদা প্রকৃতির মধ্যে সাদা পোশাকের মনু সাঁইয়া - হাতে সাদা লবণ। সফেদ রানের ভূমিপুত্র মনু সাঁইয়া।

কচ্ছের রানের সীমাহীনতায়

সবার কথা অমান্য করে আপনি এগিয়ে যেতে উদ্যত হবেন। দু-পা এগোবেন। তখনই সাদা লবণ থেকে ঠিকরে আসা আলোর ঝলকানিতে আপনার চোখে ধাঁধা লাগবে। আপনার মনে পড়ে যাবে এক সাহেবের লেখা একটা কাহিনি, যিনি একা জিপ চালিয়ে রানের ভিতরে কুড়ি-পঁচিশ মাইল চলে গিয়েছিলেন। তিনি জিপ থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে উপভোগ করছিলেন সেই প্রাণহীন, বর্ণহীন, শব্দহীন, সীমাহীন তেপান্তরকে। এক সময়ে ফেরার ইচ্ছে নিয়ে পিছন ফিরতেই তাঁর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গিয়েছিল দুপুরের চড়া সূর্যালোকে উত্তপ্ত শুষ্ক বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়েও। গাড়িটা থেকে দুশো মিটার দূরে দাঁড়িয়ে তিনি গাড়িটা দেখতে পাচ্ছিলেন না। সূর্যের আলোয় লবণ-তল এত চকচক করছিল যে তিনি তাঁর নিজের

পদচিহ্নগুলিও দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল - 'হারিয়ে গেছি আমি।' নিজের বোকামির জন্য নিজেকে অভিসম্পাত দিচ্ছিলেন। মনে পড়ে গিয়েছিল আর একজন অভিযাত্রীর কথা - উত্তর মেরু-অভিযানের সময়ে যিনি হঠাৎ-ওঠা তুষারঝড়ের কবলে পড়ে যেখানে প্রাণ হারিয়েছিলেন, সেই জায়গাটা ছিল তাঁর তাঁবু থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে। রানের সাহেব অবশ্য ফিরতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর কথা মনে করে আপনি আরও এগোনোর ইচ্ছা ত্যাগ করবেন।

* * *

এবার ফেরার পালা। মনু সাঁইয়া একটা প্লাস্টিকের থলিতে অনেকটা লবণ ভরে নেবে, আপনারাও নেবেন। মনু সাঁইয়াকে জিজ্ঞেস করবেন তার গ্রাম কোথায়। সে বলবে কাছেই; ভিলেজ রিসর্টটা থেকে এক ক্রোশ এগিয়ে। সে বলবে এর আগে অনেক সাহেবের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। তাদের একজন ছিল রাজস্থানি সাহেব। তাকে সে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। দুধ খাইয়েছে, ছাঁচ খাইয়েছে। খুব বড় সাহেব সে। মনু সাঁইয়াকে ফোন নম্বর দিয়ে গেছে। সে তার পকেট থেকে মোবাইল বের করে, সাহেবের নম্বর খুঁজে বের করে আপনাকে বলবে তাঁকে ফোন করতে। আপনি প্রায় বাধ্য হবেন হালকা চালে তাকে জিজ্ঞেস করতে, সে আপনাদেরও বাড়ি নিয়ে যেতে রাজি কি না। সে বলবে 'কিঁউ নেহি?' সে আবারও সেই রাজস্থানি সাহেবের কথা বলবে। বলবে সে তাকে কত যত্ন করেছিল, সাহেব কতটা খুশি হয়েছিল। বহুবার বলবে।

এক সময়ে আপনাদের নজরে পড়বে কাদার ওপারে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে, তার একটা আপনাদের। বুঝতে পারবেন অন্য গাড়িটাকে আসতে দেখে আপনাদের গড়ির চালক সাহস পেয়ে তাকে অনুসরণ করেছে। গাড়িতে ওঠার আগে মনু সাঁইয়া একটা নম্বর দিয়ে সেখানে আপনাকে ফোন করতে বলবে, কারণ তার নিজের ফোনে প্রয়োজনীয় ব্যালেন্স থাকবে না। এটা তার ছেলের নম্বর। সে ছেলেকে জানিয়ে দেবে যে আপনারা তার বাড়িতে যাচ্ছেন, যেন খাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখে। চেকপোস্টে পৌঁছে আপনারা দাঁড়াবেন। দু-জন রক্ষীর একজন হয়তো অসমিয়া। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে দাঁড়িয়ে বাঙ্গালী-অসমিয়া তো দেশোয়ালি ভাইয়া। সে আপনাদের সঙ্গে অনেক গল্প করবে। তার সঙ্গী চা বানিয়ে খাওয়াবে। তখনই নজরে পড়বে, দূরে কাঁচা রাস্তাটার ওপর আপনাদের দেখা অন্য গাড়িটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছুক্ষণ। চাকা কাদায় বসে গিয়ে গিয়েছে। আপনাদের ড্রাইভার, রক্ষীদের একজন আর আপনাদের মধ্য থেকে দু-একজন ছুটবে গাড়িটাকে উদ্ধার করতে, সঙ্গে অবশ্যই মনু সাঁইয়া। কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়িটাকে বিপদ-মুক্ত করে সবাই ফিরে আসবে। গাড়িটা চেকপোস্টের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে। তাদের আরোহীরা - দুই জোড়া ধনী গুজরাটি দম্পতি - আপনাদের কিংবা রক্ষীদের কাউকে ধন্যবাদ না জানিয়েই চলে যাবে। হয়তো ভাববে এই লোকগুলোর পক্ষে এটা করাই দস্তুর, ধন্যবাদ দেওয়াটা বাতুলতা। টাকা বাড়তি হলে হয়তো সৌজন্যে ঘাটতি পড়ে। ফেরার পথে থোরডোর অতিথিশালাটায় একবার ঢুঁ মারবেন। চত্বরটার গেটের সামনে একটা উটে টানা সুসজ্জিত গাড়ি দেখতে পাবেন। রথ বলা যেতে পারে। মনু সাঁইয়ার কাছে জানতে চাইবেন সেটাই সরপঞ্চের গাড়ি কিনা। অতিথিশালার লোকেরা জানিয়ে দেবে, তা নয়, এটা ট্যুরিস্টদের প্রমোদ-ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত হয়। অতিথিশালার বাইরের চেহারাটা গ্রাম্য তাই নাম 'ভিলেজ রিসর্ট'। ভিতরটা বিলাসবহুল। এটা পুরোপুরি ব্যবসায়িক, গ্রাম-কমিটির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।

মনু সাঁইয়া, তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের আরও কয়েকজন

থোরডোর স্টেট ব্যাঙ্কে পৌঁছাবার আগেই মনু সাঁইয়ার নির্দেশে ডান দিকে নেমে যাবে গাড়িটা। কয়েক মিনিট পরেই দেখবেন কিছু বড় বড় গাছ, আর তার ফাঁকে দু-একটা বাড়ি। তারই একটা মনু সাঁইয়ার। গাড়ির আওয়াজ পেয়েই দশ-বারোটা বাচ্চা কেউ সস্তার জামা পরে, কেউ খালি গায়ে - জমাট বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবে আপনাদের দিকে তাকিয়ে। আপনারা ওদের দেখতে এসেছেন - ওরা দেখবে আপনাদেরকে। একজন দীর্ঘাঙ্গী স্বাস্থ্যবতী প্রৌঢ়া একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। পরনে ঘাগরা আর ব্লাউজের ওপর সূচিশিল্পময় একটা চোলি (অ্যাপ্রনের মতো), বাহুদুটো রঙিন চুড়িতে ঢাকা। মনু সাঁইয়া আলাপ করিয়ে দেবে তার স্ত্রী। পাশে তার বড় ছেলে। তার ধোপদুরস্ত সাদা জামা, ধুতির জায়গায় পাজামা, মাথায় রিবকের ছাপ লাগানো টুপি - নতুন প্রজন্মের পোশাক। রাস্তার দিকে পিছন ফেরানো টালির দো-চালা ইঁটের দেওয়ালের যে ঘরটা, তাকে বাঙালি মতে বৈঠকখানা বা দলিচ বলা চলে। বারান্দা আর ঘরের দেওয়ালে চুন এবং বিভিন্ন রঙ দিয়ে নকশা করা। সামনে একটা মোটরবাইক দাঁড় করানো। আপনাদের বসানো হবে দলিচের ঘরে এবং বারান্দায়। দলিচের সামনে দশ-বারো মিটার দূরে একটা মাটির ঘর; সেটারও সামনে একটা বারান্দা, উঠোন থেকে অনেকটা উঁচু। ঘরটার মুখ বৈঠকখানার দিকে নয় পাশ ফেরানো হয়তো আবরুর জন্য। কয়েক মিটার দূরে দূরে এমনই কয়েকটা ঘর। একেকটা এক এক ছেলের। মনু সাঁইয়া জানাবে এই হল তার যৌথ পরিবার। বাচ্চাগুলো এসে জমা হবে বৈঠকখানায়। তারা সবাই স্কুলে পড়ে, হিন্দি বোঝে, বলতে পারে। তারা আপনাদের সঙ্গে আলাপ জমাবে। আপনার বুকে ঝোলানো ক্যামেরাটা দেখে বলবে, 'ফটো মারো।' আপনি ফোটো তুলবেন। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা করে। যখনই ভাববেন একক ছবি তোলার পালা শেষ, তখনই নতুন একটা ছেলে বা মেয়ে এসে বলবে, 'ফটো মারো।' ডিজিটাল ক্যামেরার পর্দায় ছবি দেখেই তাদের আনন্দ ছাপানো ছবি পাক বা না পাক।

আপনাদের ভ্রমণ-দলের একমাত্র-নারীসদস্য আপনার স্ত্রীকে ডেকে নেওয়া হবে অন্দরমহলে। কিছুক্ষণ পরে আপনার ডাক পড়বে ছবি তোলার জন্য। ঘরে ঢুকে দেখবেন একটা সাদা ধবধবে কয়েক দিনের বাচ্চা আপনার স্ত্রীর কোলে। গাত্র-বর্ণ উজ্জ্বল গৌর হওয়া সত্ত্বেও আপনার স্ত্রীর নাম কৃষ্ণা। এখন ওই বাচ্চা-কোলে তাকে দেখে সেই নামকরণের সার্থকতা সম্পর্কে আপনার সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হবে। পরে যখন জানতে পারবেন যে বাচ্চাটার সারা অঙ্গে পাউডার মাখানো ছিল, তখন অবশ্য আপনার স্ত্রীর নামকারকের দক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ পুনর্জাগরিত হবে। আপনি সেই ছবি তুলবেন। বাচ্চার মায়ের বয়স সতেরো-আঠেরো বাচ্চা-কোলে তার ছবিও তুলবেন। বাচ্চাটাকে একটা দোলনা-বিছানায় শুইয়ে দেওয়ার পর মনু সাঁইয়ার স্ত্রী আপনাকে জিজ্ঞেস করবেন আপনারা তাদের হাতের কাজের জিনিস-পত্র দেখতে চান কি না। আপনার মনে একটা সন্দেহের আভাস জাগবে। তবু সম্মতি জানাবেন। শুরু হবে আপনার স্ত্রীকে সাজানো। ঘাগরা, চোলি, গলায় রুপোর কাডলা (হাঁসুলি), পুঁতির হাসডি (চিক) আলমারি, বাক্স, ট্রাঙ্ক খুঁজে খুঁজে এক-একটা বের করে এক-এক জন পরিয়ে দেবে। ছোট্ট ঘরটা ভর্তি সক্রিয় নারীবাহিনীর মধ্যে একমাত্র পুরুষ আপনি, নীরব দর্শক। আপনার কিছুটা অস্বস্তি হবে। এক পুত্রবধূ নিজের খোঁপা থেকে একটা ত্রিভুজাকৃতি পুঁতির অলঙ্কার (আম্বাডা) খুলে পরিয়ে দেবে তার মাথার। একজন একটা ওড়না দিয়ে ওর মুখটা একদম ঢেকে দেবে বিয়ের কনের মতো। আপনাকে বলা হবে, 'ফটো মারো।' আপনি ফটো তুলবেন। আপনার স্ত্রীকে বলা হবে আয়নায় নিজেকে দেখতে। সাজটা কেমন সেটাও জিজ্ঞেস করা হবে। সেই সজ্জার নতুনত্ব এবং পুঁতি ও সূচিকর্মের সূক্ষ্মতা, বৈচিত্র ও বিশালতা আপনাকে অভিভূত করবে। গৃহকর্ত্রী সেটাই চাইছিলেন। তিনি আপনার নিবিষ্ট চোখদুটোকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বলবেন, 'কিনবে?' আশঙ্কা-মিশ্রিত কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, 'কত?' উত্তর মিলবে, 'পাঁচ হাজার।' আপনারা দু-জনেই চমকে উঠবেন। আমতা-আমতা করে বলবেন, 'বেড়াতে বেরিয়েছি, অত টাকা নিয়ে তো আসিনি।' আপনি বুঝবেন আপনাকে সেখানে ডাকা হয়েছে শুধুমাত্র চিত্রগ্রাহক হিসেবে নয়, তহবিলের ধারক হিসেবেও। ওদের এবং আপনাদের, উভয়ের হিন্দি-জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে পারস্পরিক

বোঝাপড়া অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আপনার ভীষণ ভয় করবে। পকেট থেকে অনেক টাকা না খসিয়ে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব বলে মনে হবে। কেড়েকুড়ে নেবে কিনা সে-সন্দেহও হবে। তখনই দরজার বাইরে থেকে উঁকি মারবেন বড় ছেলে। তিনি ওদেরকে বুঝিয়ে বলাতে ওরা একটা একটা করে দাম বলতে থাকবে। চোলিটা দু-হাজার, ঘাগরা এক হাজার, ইত্যাদি। শ্রমের মূল্য হিসেব করলে বিশেষ অবৈধ দাম বলছে বলে আপনার মনে হবে না। কিন্তু, কী হবে তা দিয়ে? কে ব্যবহার করবে? আপনার দেশে তো সেগুলি বেমানান। বেড়াতে এসে এত টাকা খরচ করবেনই বা কেন? শেষ পর্যন্ত একশো টাকায় গলার হাসডি বা চিকটা নেওয়ার পর ছাড়া পাবেন। বাইরের ঘরটায় ফিরে আসবেন দু-জনে। এবার আসতে শুরু করবে গ্রামের অন্য বাড়িগুলির কিশোরীরা। গলার চিক, বাজুবন্ধ যে যা পারে তাই নিয়ে। একজন নিয়ে আসবে মাথায়-পরার পুঁতিতে গাঁথা একটা চওড়া গোল বেড়ি, যার এক পাশ থেকে এক-দেড় ইঞ্চি চওড়া চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা পুঁতি আর সুতোয় গাঁথা একটা

মনু সাঁইয়ার বাড়িতে

ইন্ধনি

লেজ ঝুলবে (অলঙ্কারটার নাম ইন্ধনি)। কেউ হয়তো নিজের খোঁপার সাজটা (আম্বাডা) খুলে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিয়ে আসবে। পঞ্চাশ-একশো যা পাওয়া যায়। চাপমুক্ত পরিবেশেও উপরোধ এড়ানো কঠিন হবে। আপনার যাত্রাসঙ্গীদের কেউ এবং আপনার স্ত্রী আরও কিছু কিনবেন।

তবে কি এই জন্যই মনু সাঁইয়ার আমন্ত্রণ ছিল? আপনার মনে প্রশ্ন জাগবে। আপনার মনে পড়বে বাতাপী-ইল্বলের গল্প। তবে বাতাপীরা আগে খাইয়ে পরে বধ করত; এরা আগে বধ করে পরে খাওয়াবে। সেই খাবারের যেমন স্বাদ, তেমন বৈচিত্র্য আর তেমনই প্রাচুর্য পরিবেশনেও তেমনই আন্তরিকতা। ঘি-মাখানো রুটি, পরোটা, তিন রকম সবজি, শেষে চাটনি, দুধ, কিছু মিষ্টি। আর গুজরাট যখন - ছাঁচ তো থাকবেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর কিছু গল্প হবে। জানতে পারবেন, মনু সাঁইয়ার ছেলেমেয়েদের সবারই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। চাষযোগ্য জমি আছে সামান্যই। এক ছেলে ভুজে থাকে। বাকিরা কখনও কন্ট্রাকটারের অধীনে রাস্তার কাজ করে, কখনও নিজের জমিতে খেতিবাড়ি করে, কখনও অন্যের জমিতে মজুর খাটে। গল্প চলতে চলতে আপনি মনু সাঁইয়ার হাতে এক হাজার টাকা দেবেন। সে না-না করেও টাকাটা নেবে, খুশি হয়েই। বিদায়ের আগে সব নাতি-নাতনিদের নিয়ে কর্তা-গিন্নি হাজির হবে, সঙ্গে সবকটি পুত্রবধূ, আর বড় ছেলে। আপনারা গাড়িতে উঠবেন। আপনাদের গাড়িটা বাঁক ঘুরে তাদের চোখের আড়াল না-হওয়া পর্যন্ত তারা হাত নাড়বে।

পথে পড়ে আপনারা মনু সাঁইয়ার চালাকি নিয়ে আলোচনা করবেন। হিসেব করবেন টাকাটা বেশি দেওয়া হয়ে গেল কি না। তারপর, নক্ষত্রানা পর্যন্ত ছ-ঘন্টার যাত্রাপথে যখন খানা তো দূরের কথা, কোনও চায়ের দোকানও চোখে পড়বে না, তখন মনে হবে-

ভাগ্যে মনু সাঁইয়া ছিল,
কী দুর্দশাই হত তা না হলে।

* * *

কৃতজ্ঞতা:
১) Tourism Corporation of Gujarat Limited
২) Shaam-E-Sharhad Village Resort
৩) India- The Rann of Kutch, The haunted and mysterious wasteland between India and Pakistan, by David Yeadon
৪) ২০১১-র ফেব্রুয়ারিতে কচ্ছ-ভ্রমণে লেখকের সঙ্গী - রাধাদা, অংশুদা, মৃণালজ্যোতি এবং শ্যামলী।

কচ্ছের রান - অনন্ত ধবলতা

~ কচ্ছের রানের আরও ছবি ~

এজি বেঙ্গল থেকে অবসরপ্রাপ্ত কেরানি সোমনাথ ভট্টাচার্যের অনিয়মিত অভ্যেস গল্প, কবিতা লেখা - কচ্চিৎ-কদাচিৎ বেড়ানোর গল্পও। বেড়ানোর নেশা বলতে তেমন কিছু নেই। তবে চাকরি করাকালীন এলটিসির দৌলতে তো হতই, তার পরেও আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গ পাওয়ার সু-যোগে বেড়ানো হয়ে যায় প্রায়ই। এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে দূরে কোথাও যেতে তো ভালো বাসেনই, আবার ঘর থেকে দুই পা ফেলে নারকেল গাছের মাথায় সূর্যাস্ত দেখেও আনন্দ পান।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ভ্রমণ তো বানিয়ে তোলা গল্পকথা নয়, মানুষের সত্যিকারের জীবনকাহিনি। আর তাই ভ্রমণকাহিনি মনে শুধু আনন্দই এনে দেয় না, আনতে পারে চোখে জলও। জাগিয়ে তুলতে পারে জীবনজিজ্ঞাসা, প্রতিবাদের ভাষা। ট্যুরিজম ইন্ড্রাস্ট্রির সহায়ক বিজ্ঞাপনী প্রচারমাধ্যম ছাড়াও ভ্রমণকাহিনির বড় পরিচয় বিশ্ব সাহিত্যের একটি অন্যতম ধারা রূপেও। তেমনই কিছু 'অন্য ভ্রমণ' কথা।

বালিপাসে মুখোমুখি

সুমন বিশ্বাস

আনন্দ...

দৃশ্য ১

গিরিবর্ত্মের উপরে দাঁড়িয়ে এক মধ্যবয়স্ক পুরুষ, সঙ্গে রয়েছে তার কয়েকজন বন্ধু। আজ তাদের হিমালয়ে পদচারণার চতুর্থ দিন। অবশেষে লক্ষ্যে পৌঁছেছে তারা। লক্ষ্য কী? একটা পাহাড়ের ওপরে পৌঁছানো, তারপর অন্য দিকে নেমে যাওয়া। পাহাড়ের ঠিক ওপরে তুষার নেই, যদিও তুষার মাড়িয়ে, তুষারে ধাপ কেটে তাদের এখানে পৌঁছতে হয়েছে। শনশন শব্দে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, চকচকে নীল আকাশের বুকে ঝকঝকে সূর্যের আলোয় চারিদিকের দৃশ্য অতি চমৎকার।
পুরুষটি অন্যদের থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে পাথরের ওপরে বসল। অন্যরা তাকে ডাকছে একসঙ্গে ছবি তোলার জন্যে, তার কানে আদৌ সে ডাক ঢুকছে বলে মনে হচ্ছে না। দুহাতে চোখ মুখ ঢেকে সে বসে আছে তো আছেই, অন্যরা ভাবল ও হয়তো ক্লান্তিতে অমন করে বসে আছে। ক্লান্ত হওয়ারই তো কথা, এই কদিন ওদের সবার ওপর দিয়ে যা গেছে! আজ সকালের কথাই ধরা যাক না।

বালি উদারি থেকে যমুনোত্রী পাসের পথে, নালার জল জমে বরফ

হিমাঙ্কের নীচের অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় সারা রাত তাঁবুতে এপাশ ওপাশ করেছে, ঘুম আসেনি। শেষে ভোর চারটে নাগাদ দুত্তোর বলে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে, ভেবেছে মুখ-টুখ ধুয়ে রওনা দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নেবে। ও হরি, তাঁবুর ভেতর থেকে জলের বোতল বার করতে গিয়ে দেখে পুরো জলটাই জমে বরফ হয়ে গেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে হেডল্যাম্প জ্বালিয়ে মুখ ধুতে যেতে হয়েছে পাশ দিয়ে কুলকুল শব্দে বয়ে যাওয়া এক পাহাড়ি নালায়। ঠান্ডায় হাত-মুখ কেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাড়াতাড়ি এসে পোর্টারদের প্রাতরাশ তৈরি করার আগুনে হাত সেঁকে মুখে রক্ত সঞ্চালনের জন্যে হাত দিয়ে ঘষাঘষি করে নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়েছে।
অন্ধকার তখনও একইরকম। যদিও দৃষ্টি খানিকটা সয়ে গেছে এতক্ষণে, অন্ধকার আর অত ঘন মনে হচ্ছে না। মাথার ওপর তারারা অস্বাভাবিক উজ্জলতা নিয়ে চেয়ে আছে, সব থেকে বড় চোখ তাদের মধ্যে চন্দ্রদেবের। সামনে যেন ঢিলছোঁড়া দূরত্বে স্বর্গারোহিণী শৃঙ্গ অপার্থিব সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে। কারোর কারোর মতে এই শৃঙ্গ ধরে পাণ্ডবেরা সশরীরে স্বর্গে যেতে চেয়েছিলেন, অবশ্য এই মানুষটির সামনে শৃঙ্গটির যে দিকটি রয়েছে, সেই দিক ধরে নয়, তার বিপরীতে সতোপন্থ তালের পথ ধরে। পৌরাণিক কাহিনি যাই হোক না কেন, শৃঙ্গটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লোকটির মনে হল, স্বর্গ থাকুক বা না থাকুক, স্বর্গ নামক কল্পনার চিরকালীন আনন্দলোকে পৌঁছানোর পথ যেন এমনটাই হয়!
.....না, ট্রাভেলগ লেখা আমার কম্ম নয়! সেই এরপর কত কষ্ট করে আজ সকালে বালি উদারি (১২৫০০ ফিট) থেকে শুরু করে ঘন্টা ছয়েক হেঁটে যমুনোত্রী পাসে, যা সাধারণভাবে বালি পাস (১৬০০০ ফিট) নামে পরিচিত পৌঁছানো, ভয়কে জয় করে পদে পদে পা পিছলে গভীর খাদে পড়ার বা পাথর গড়িয়ে মাথায় পড়ার বিপদের আশঙ্কা পেরিয়ে পাহাড় ভাঙা, পথের অভাবে জমে যাওয়া পাহাড়ি নালা ধরে এগোনো, জলের অভাবে কষ্ট পাওয়া, ক্রিভাস এড়িয়ে সূর্যের আলোয় চোখ ঝলসে দেওয়া হিমবাহের ওপর দিয়ে চলা, তারপর দড়ি ছাড়া শুধু আইস অ্যাক্সের সাহায্যে প্রায় ৬০ ডিগ্রি খাড়া পাথর গড়িয়ে পড়া পাহাড়ি দেওয়াল বেয়ে ওঠা, এসবের খুঁটিনাটি বর্ণনা ট্রাভেলগের বৈশিষ্ট্য। এগুলো একেবারেই

যেন ক্লিশে হয়ে গেছে, যেকোন পাহাড়ে হাঁটার বিবরণে এসবের একঘেয়ে বর্ণনা পড়তে আমরা অভ্যস্ত। মাঝে মাঝে ঘটা বা না ঘটা দু-একটা দুর্ঘটনার বর্ণনাও গুঁজে দেওয়া দস্তুর। এমন লেখা পড়তে আমার ভালো লাগে না, নিজে লিখতেও ইচ্ছা করে না, লিখছিও না। বদলে যা দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেই অনুভূতির বর্ণনাকেই বিষয় করা যাক। শুধু দুটি কথা বলে নিয়ে সেদিকে এগোই।

বালি উদারি থেকে যমুনোত্রী পাসের পথে, পেছনে স্বর্গারোহিণী পর্বত

দলের কেউ উচ্চতাজনিত অসুস্থতায় আক্রান্ত হয় নি, তার কারণ মনে হয় দলের সকলের উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার আগ্রহ, রোজ হাড়ভাঙা খাটুনির পরে ক্যাম্পে পৌঁছেও কেউ তাঁবুতে ঢুকে শুয়ে পড়েনি তক্ষুনি, বরং আশপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে। শুয়েছে শুধু রাত্তিরটুকুতে। নাহলে এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রমের ট্রেকে, যেখানে পিছিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই - অসুস্থজনকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই, সেখানে কেউ উচ্চতাজনিত কারণে অসুস্থ হলে ভীষণ মুশকিলে পড়তে হত।

আর উল্লেখ করতে হয় ফেনকমলের কথা। দুর্লভ এই ফুল হিমালয়ের সর্বত্র ফোটে না, এখানে সেই ফুলের ছড়াছড়ি। একটাই দু:খ, ফুলগুলো প্রায় শুকিয়ে এসেছে, যার সৌন্দর্য সম্বন্ধে এত পড়া যায়, তার কিছুই উপলব্ধি করা গেল না। বর্ষাকালে, নিদেনপক্ষে সেপ্টেম্বরে এলেও ফুলগুলোকে দেখার সুযোগ হত তাদের পূর্ণবিকশিত রূপে।

যা বলছিলাম, পুরুষটি মুখ ঢেকে বসে আছে কেন? সবাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত, ঝকঝকে সূর্যালোকে একদিকে স্বর্গারোহিণী পর্বতের সবকটি শৃঙ্গই স্বমহিমায় উজ্জ্বল, অন্যদিকে কালানাগ, বান্দারপুঁছ আর ইয়েলো টুথ, তাদেরও সৌন্দর্য কিছু কম নয়। নাম না জানা আরও কত শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে চারিদিকে। মানুষটি সে সব কিছুই দেখছে না, কিছুই কি তার দেখার আগ্রহ নেই, তাহলে কি করতে এসেছে এখানে?

যমুনোত্রী পাসের উপর থেকে স্বর্গারোহিণী পর্বত

যেদিন থেকে হাঁটা শুরু করেছে, প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ করেছে মানুষটি। হিমালয়কে ভালবাসে সে মনপ্রাণ দিয়ে, হিমালয় তাকে কখনো নিরাশ করে না, এই কয়েকদিনের পদচারণাতেও প্রতিটি মুহূর্ত হিমালয় তার ভালবাসার প্রতিদান দিয়েছে, নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে মানুষটির সামনে। আনন্দে মন ভরিয়ে দিয়েছে, তৃপ্তিতে বুক ভরিয়ে দিয়েছে। আর এখন? ভাল করে দেখা যাক তো...

একী, হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে আছে মানুষটি, আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে তার চোখে যেন জল দেখা যাচ্ছে? সেই কবে থেকে ওর সঙ্গে পরিচয়, শৈশবের পরে তো ওর চোখে আর জল দেখি নি, বেশ বুঝতে পারছি বেচারি খুব লজ্জায় পড়ে গেছ, যদি ওর চোখের জল কারোর নজরে পড়ে যায়, তাই অমন ভাবে মুখ লুকিয়ে রয়েছে। এত বছরে যার চোখে কখনো জল দেখিনি, কী হল তার? অন্যদের চোখ এড়িয়ে প্রশ্ন করলাম।

জলভরা চোখ তুলে সে আমাকে উত্তর দিল, "এটুকুও বোঝ না? তুমি আবার কতদিন ধরে হিমালয়ে হাঁটাহাঁটি করছি বলে গর্ব কর? একেই আনন্দাশ্রু বলে। জীবনে এমন আনন্দ আগে কখনো পাই নি, তাতেই মনে হয়..."

আমার অসহিষ্ণু উত্তর, "সে তো চিরকালই দুজনে একসঙ্গে থেকেছি, তোমার এই হাল তো আগে কখনও দেখি নি?"

"আমিও অবাক হয়ে যাচ্ছি, দেখ না, চোখের জল থামানোর চেষ্টা করছি, কিছুতেই থামাতে পারছি না।"

"কেন, আজ কী এমন হল?"

"জানি না, কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু মন জুড়ে এমন এক আনন্দ, যার ব্যাখ্যা ভাষায় প্রকাশ করতে পারার ক্ষমতা নেই আমার। এমন কত জায়গাতেই তো পৌঁছেছি আগেও, উত্তরাখণ্ডে, হিমাচলে, সিকিমে, নেপালে - আগে তো কখনও এমনটা হয় নি।"

হেসে ফেললাম। বললাম, "সামান্য ট্রেকের গন্তব্যে পৌঁছেই এত আবেগের বাড়াবাড়ি? কোনও শৃঙ্গের মাথায় উঠতে পারলে তাহলে কী করতে? বুড়ো হয়ে যাচ্ছ নাকি?"

লোকটিও হেসে ফেলল, "হবে হয় তো। আর না, সবাই ডাকছে, চল এবার দেখি পুজো কেমন হচ্ছে।"

গাইড আর ওদের দলের স্থানীয় সহায়কদের দিকে এগিয়ে গেল সে। ততক্ষণে পুজো হয়ে গেছে। পুজোর প্রসাদের নকুলদানা খেল। তা ও খায়, নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও পুজোর প্রসাদে ওর আপত্তি নেই, বলে - "খাবার জিনিস খাব না কেন? এর সাথে ভক্তিফক্তির কোন সম্পর্ক নেই!"

তা তো হল, গাইডের হাত থেকে শুকিয়ে যাওয়া পচা নারকেল প্রসাদ চেয়ে নিচ্ছে কেন? ওটা তো খাওয়ার অযোগ্য। তালুকা গ্রামের মুদি দোকানী সুযোগ পেয়ে দিব্যি ঠকিয়েছে পচা নারকেল গছিয়ে দিয়ে। তার টুকরো ও চেয়ে নিয়ে রুকস্যাকে গুছিয়ে রাখছে কেন? হিমালয় ওকে ভগবানে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ল নাকি?

সুযোগ পেতেই খোঁচা মারলাম, "এটা কী হল?"

উত্তর পেলাম, "জ্বালিও না তো। মায়ের জন্যে নিলাম।"

"ওই পচা নারকেল?"

"মায়ের হাতে দেব, পচা কী ভাল মা বুঝবে, হাতে পেলেই মা খুশী হবে। আমার এই কয়দিনের আনন্দের ভাগ তো মাকে দিতে পারব না, প্রসাদটুকুই তাই দেব।"

"অত আনন্দ আনন্দ কর না, নীচে নামবে কি করে ভেবে দেখেছ? নামবে যেদিকে সেদিকে তো খাড়া দেওয়ালের মত পাহাড়ের ঢাল। পিঠে পনেরো কিলোর বোঝা নিয়ে নামতে পারবে?"

"সে দেখা যাবে।"

ওপরের ঘটনার পর তৃতীয় দিন।
লোয়ার দামনির জঙ্গল ছেড়ে ঘণ্টাখানেক হেঁটে ওরা সবাই নেমে এসেছে বাঁধানো রাস্তায়। পথের একদিকে সার দিয়ে রকমারি দোকান, অন্যদিকে গভীর খাত দিয়ে যমুনা নদী বয়ে চলেছে তীব্র স্রোতে। বাঁধানো পথটি ধরে বাঁ দিকে কয়েক কিমি গেলে যমুনোত্রীধাম। ধামের দিকে যাওয়ার আগ্রহ নেই দলের কারোরই। বদলে ডান দিকে কয়েক কিমি হেঁটে ওরা জনপদে পৌঁছাবে, যেখান থেকে গাড়ির পথ শুরু। সেই দিকে রওনা দেওয়ার আগে বেশ কয়েক দিন পরে সভ্য জগতে ফিরে আসাটাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে পালন করতে হবে না? একজনের চা খাওয়ার প্রস্তাবে দলের সবাই তাই সানন্দে সাড়া দিল।

যমুনোত্রী ধামের পথ নির্দেশ

সেই লোকটিকে আবার চোখে পড়ল, মনোযোগ দিয়ে ধামের যাত্রীদের দিকে দেখছে। যাঁরা বাঁদিকে যাচ্ছেন তাঁদের ধামে পৌঁছতে সময় লাগবে এখনও খানিকক্ষণ, আর যাঁরা ডানদিকে যাচ্ছেন, তাঁদের তীর্থদর্শন সাঙ্গ হয়েছে, ফিরে আসছেন। পদযাত্রী নেই বললেই চলে, যাঁরা যাচ্ছেন সবাই মোটামুটি খচ্চরের পিঠে বা মানুষের কাঁধে চেপে, সবই ডান্ডি, কান্ডি একেবারেই চোখে পড়ছে না। ওদের দিকে তাকিয়ে আমাদের পরিচিত সেই মানুষটি কি এত দেখছে?

যমুনোত্রী ধামের যাত্রী, খচ্চরে চেপে চলেছেন

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি দেখছ এত আগ্রহ নিয়ে?"
"জানই তো, এতদিন হিমালয়ে আসছি, কখনও কোন তীর্থের এত কাছে আসিনি, আজ এই প্রথম এলাম। সবার কাছে শুনেছি এই তীর্থপথ নাকি খুব দুর্গম, কোথায়? বাঁধানো রাস্তা, ধারে লোহার রেলিং, খাদে পড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।"
"দুর্গম ছিল একসময়, বইতে পড়েছ নিশ্চয়। এখন কি আর তা থাকে? কোন তীর্থই এখন আর আগের মত দুর্গম নেই। দিনকাল বদলেছে, এখনকার তীর্থযাত্রীরা কি অতীতে বইতে যেমন পড়া যায় তেমন কষ্ট সহ্য করে তীর্থে যায় নাকি? অত সময় কোথায় এখনকার মানুষের হাতে?"
"তা তুমি মন্দ বল নি। কিন্তু শুধু যাত্রাপথটাই কি বদলেছে? আর কিছু বদলায় নি?"
"আবার কী বদলাবে? সেই তো দলে দলে মানুষ চলেছে, আগেও যেত, এখনও যাচ্ছে।"
"কিছুই তোমার চোখে পড়ে না। মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ। কী দেখছ?"
"কী আবার দেখব?"

যমুনোত্রী ধামের যাত্রী, ডান্ডি চেপে চলেছেন

"কত দূর দূর অঞ্চল থেকে এরা সব এসেছে, কেউ অভীষ্ট পূরণের এত কাছে, কেউবা লক্ষ্যে পৌঁছে ফিরে আসছে, এদের চোখেমুখে তৃপ্তি বা আনন্দের ছাপ কোথায়? খচ্চরের পিঠে যারা যাচ্ছে, তাদের চোখেমুখে শুধু ভয় ফুটে বেরোচ্ছে। আর যারা মানুষের পিঠে চেপে যাচ্ছে তাদের মুখে যেন কলকাতার হাতে টানা রিকশায় চেপে যাওয়ার সময়ে যাত্রীদের মুখে যে গর্বোদ্ধত ভাব দেখা যায়, তেমন একটা ভাব।"
বললাম, "তুমি বড় বাজে বকো।"
"বাজেই বকছি হয়তো। কিন্তু কী জান, হিমালয়ের পথে পথে হাঁটতে গিয়ে অনুভব করেছি সব সময়, হুজুগে কিছু লোককে বাদ দিলে যারাই আমাদের মত পথ হাঁটে, শুধু লক্ষ্যে পৌঁছানোটা তাদের উদ্দেশ্য থাকে না, চলার পথের আনন্দই তাদের টেনে আনে এখানে। পথের সব কষ্ট তাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। এতদিন বইতে পড়ে পড়ে তীর্থযাত্রীদের সম্বন্ধেও যেন সেই ধারণাই মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। হিমালয়বিষয়ক লেখাতে কত সময় পড়েছি ভক্তি আর পুন্যার্জনের আগ্রহ এই তীর্থযাত্রীদের টেনে এনে পথে নামায়, দুঃখ কষ্ট পেতে পেতে তারা গন্তব্যে পৌঁছায়, আর পুরো যাত্রাপথটাই তারা হিমালয় ভ্রমণের আনন্দ পায়। ভেবেছিলাম তেমন আনন্দই তারা পায় যেমন আমরাও পাই, আমরা - যাদের মধ্যে ভক্তির ছিঁটেফোঁটাও নেই। কিন্তু আজ এদের মধ্যে সেই আনন্দটাই তো চোখে পড়ছে না। যেন কর্তব্য পালনে চলেছে, একটা ধাম 'শেষ' করে আরেক ধামের দিকে যেতে হবে, সেই তাড়া এদের মধ্যে, কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছানোর বা পথ চলার তৃপ্তি বা আনন্দ কাউকেই তো পেতে দেখলাম না। এখনকার ভক্তি কি তাহলে এমনটাই? নামকরা সব লেখকেরা তাহলে কী লিখে গেছেন? মনে হয় গাড়িতে চেপে, তারপরে মানুষ বা খচ্চরের পিঠে চেপে যাওয়ার ফলে আর আগের সেই তীর্থযাত্রার কষ্ট নেই বলেই এদের মধ্যে লেখকদের বলা সেই আনন্দ উপভোগের ক্ষমতাও হারিয়ে গেছে। আর আমরা এখনও হেঁটে হেঁটে পাহাড়ে ঘুরি বলেই আমাদের সেই আনন্দ উপভোগের আগ্রহ একটুও কমে নি মনে হয়, যা সত্তর বছর

আগে ছিল, এখনও একই রকম রয়েছে।"

"লম্বা বক্তৃতা দিয়ে ফেললে দেখছি। এই কয়জন তীর্থযাত্রীকে দেখে সবার সম্বন্ধে ধারণা করে ফেললে? অনেক বড় বোদ্ধা হয়ে গেছ!"
"তা ঠিক বলেছ, পুরোটাই হয়তো আমার দেখার ভুল, বোঝার ভুল।"
চা খাওয়া হয়ে গেছে, মানুষটি নিজের রুকস্যাক কাঁধে তুলে নিয়ে বন্ধুদের সাথে হাঁটতে শুরু করল গাড়ির পথের দিকে।

যমুনোত্রী ধামের বাঁধানো পথ, পাশে যমুনা নদী

দৃশ্য ৩

কয়েকদিন পরের কথা। সকালবেলা লোকটা কলকাতায় বাড়ি এসে পৌঁছাল। দীর্ঘ রেলযাত্রাতে ক্লান্ত, বিরক্ত। বাড়িতে ঢুকে রুকস্যাকের জিনিসপত্র খালি করছে দেখতে পাচ্ছি, যেগুলো কাচার জিনিস সেগুলো আলাদা করে রাখছে। হাতে পড়ল সেই গিরিবর্ত্মের উপরে পুজোর প্রসাদ শুকনো নারকেলটুকু, যা যত্ন করে মায়ের জন্যে নিয়ে রেখেছিল।
টান মেরে টুকরোটাকে বাগানে ফেলে দিল মানুষটি। আমি হা হা করে উঠলাম, "কর কী, কর কী!" বলে।
ও বলল, "পচা এক টুকরো নারকেল, ফেলব না তো কী করব?"
"সে তো ওখানে যখন হাতে পেয়েছিলে তখনই পচা ছিল, তখন তো দিব্যি গুছিয়ে রেখেছিলে, এখন ফেলে দিচ্ছ কেন?"
উত্তরে ও আকাশের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখাল। বলল, "কী দেখছ?"
"কি আবার দেখব? আকাশ দেখছি, একটু মেঘলা, বৃষ্টি হবে মনে হয়।"
"ধুর, তা বলছি না, আকাশের রঙটা দেখ। কেমন? ধূসর, তাই না? যখন এই প্রসাদ হাতে নিয়েছিলাম, কেমন ছিল আকাশের রঙ? ঘন নীল। হিমালয়ে ওই নীল আকাশের নীচে যাকে মনে হয়েছিল মূল্যবান, আজ এই সমতলে ধূসর আকাশের নীচে এসে তার মূল্য আর কানাকড়িও নয় আমার কাছে।"
"তোমার জন্যে তো আননি, এনেছ মায়ের জন্যে, তিনি মূল্য দেন কি না দেন সেইটা দেখবে না?"
"কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়া আমার ধাতে নেই। এবার ভাগো তো, আর বকিও না, এই কয়দিন খুব জ্বালিয়েছ, এবার আমার পেছন ছাড়। তাড়াতাড়ি চান খাওয়া করে অফিস বেরোব।"
ভাবছিলাম, পাহাড় থেকে সমতলে ফিরে সেই আনন্দই হারিয়ে ফেলল সে! এই জন্যই কি পাহাড় ওকে টানে বার বার, নতুন আনন্দের সন্ধানে?

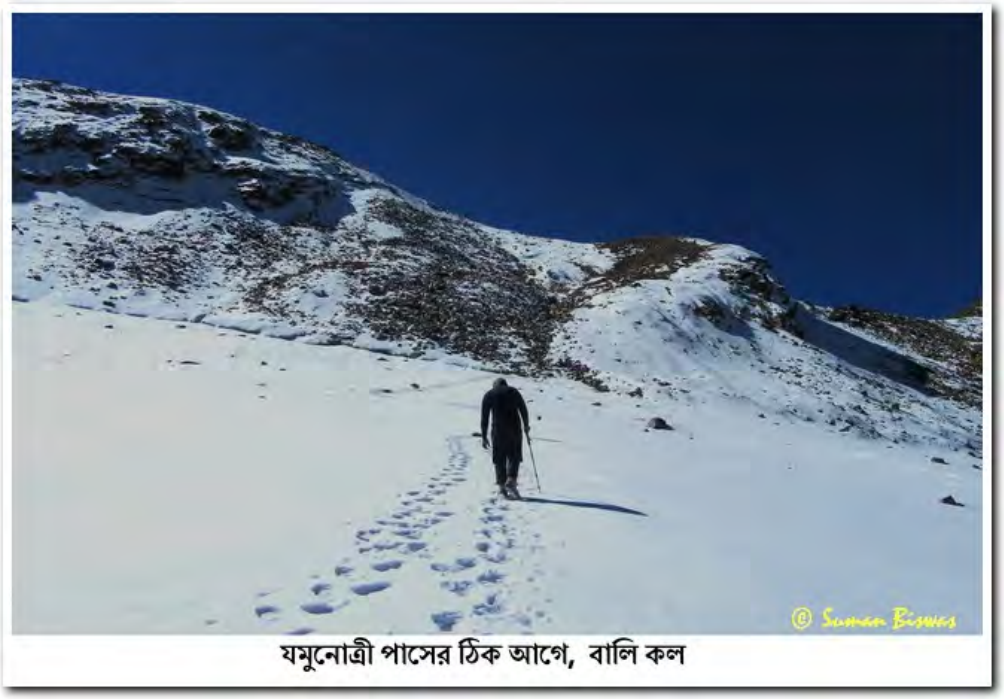

যমুনোত্রী পাসের ঠিক আগে, বালি কল

পেশায় ব্যবসায়ী সুমন বিশ্বাসকে পেশার কারণে কলকাতাতেই থাকতে হয়... কিন্তু মন পড়ে থাকে পাহাড়ে-জঙ্গলে-সমুদ্র সৈকতে। সব থেকে পছন্দ হিমালয় ভ্রমণ, তাই সময় সুযোগ পেলেই ছোটেন হিমালয়ে। পছন্দ পায়ে হেঁটে ঘোরা, গাড়িতে চাপেন যখন বাধ্য হন শুধু তখনই... আর ভালবাসেন বই পড়তে।

দুর্গাপুর - ইতিহাসের খোঁজে

তপন পাল

-১-

দুর্গাপুর। শুনলেই মনে হয়না খুব দুর্গম জায়গা?

১৭৬৫। বর্ধমানের মহারাজা জঙ্গলমহলের একাংশ পত্তনি দিলেন গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়কে। তাঁর নামে মৌজাটির নাম হল গোপীনাথপুর। আমৃত্যু গোপীনাথ চেষ্টা করে গেলেন ঘন জঙ্গল কেটে বসত বানানোর। তাঁর মৃত্যুর পর বংশধর দুর্গাচরণ সাগরভাঙা অঞ্চলে নতুন বসত বসালেন। ১৭৯৩-এ প্রতিষ্ঠিত হল কালীমন্দির, ১৮০৩-এ শিবমন্দির। সাগরভাঙার সেই জমিদারবাড়ি আজও নাকি দাঁড়িয়ে!

সময় গড়ায়। ১৮৫৪-র ১৫ অগস্ট ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি রেলগাড়ি চালাল হাওড়া থেকে হুগলী। ১ সেপ্টেম্বর রেললাইন গিয়ে পৌঁছল পান্ডুয়া, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৫-তে বর্ধমান হয়ে রানিগঞ্জ। তখনই স্থানীয় লোকজনের প্রচেষ্টায় দুর্গাচরণের নামে স্থানীয় স্টেশনের নাম হল দুর্গাপুর। ১৯০৫-এর ঘোর রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে বার্ন কোম্পানি নিঃশব্দে সূচনা করল শিল্পায়নের। অতঃপর দামোদর, মেঘনাদ সাহা, নেহরু, বিধান রায়, ভারতের রূঢ়... নানান লজের আড়ালে কোথায় যেন হারিয়ে গেল এক জনপদের লৌকিক ইতিহাস, ঐতিহ্য, পুরাতত্ত্ব।

আমাদের শৈশবে, ১৯৬৯ নাগাদ, শুকতারা পত্রিকায় হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ধারাবাহিক একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, খুব সম্ভবত নাম ছিল রক্তদেউল। ডাকাতদল কর্তৃক এক জমিদারকন্যার অপহরণ ও কালক্রমে সেই বালিকার ওই দলের নেত্রী হয়ে ওঠার উপাখ্যান। পরবর্তীকালে কোণঠাসা হয়ে ওই দলনেত্রী মেজর জেনারেল সার উইলিয়াম হেনরি স্লিম্যান (আগস্ট ১৭৮৮ - ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬)-কে জানান অমুক দিনে তিনি জঙ্গলস্থিত কালীমন্দিরে আত্মসমর্পণ করবেন। ঠগীদমনকারী স্লিম্যান নির্ধারিত দিনে গিয়ে দেখেন বালিকাটি আত্মহত্যা করেছেন, ধরা দেননি। সেই তখন থেকে আমার দুর্গাপুর দেখার ইচ্ছে। অধুনালুপ্ত হাওড়া মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার বা আজকের শতাব্দী, যখনই রেলগাড়ি দুর্গাপুরে থেমেছে আমার ইচ্ছে হয়েছে গাড়ি থেকে নেমে চলে যেতে। কিন্তু... অমন কত ইচ্ছেই তো হয়। সব কি আর পূর্ণ হয়!

২১ অগস্ট ২০১৬, রবিবার। ১৩০৫১ হাওড়া-সিউড়ি হুল এক্সপ্রেস। এই ট্রেনটিতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এতদিন কোন সংরক্ষিত কামরা ছিল না। একটি সংরক্ষিত আসনযান কামরা ডি-১ পরীক্ষামূলক ভাবে ১৫ আগস্ট থেকে ছয় মাসের জন্য ওই গাড়িতে সংযোজিত হয়। যদি সংরক্ষিত দ্বিতীয় শ্রেণী কামরার পৃষ্ঠপোষক জোটে তাহলে ওই কামরাটি পাকাপাকিভাবে ওই গাড়িতে সংযোজিত হবে। শোনা যাচ্ছে শিগগিরই গাড়িটি সুপার ফাস্ট শ্রেণীতে উন্নত হবে এবং তার ক্রমিক হবে ২২৩২১/২২৩২২। এই ট্রেনটি আগে ডিজেলে চলতো। ২০১৪-র অক্টোবরে ভালকি মাচান থেকে ফিরেছিলাম এই ট্রেনে। তদবধি তিনি ডিজেল ছিলেন। সাবেকি ALCO ডিজেল ইঞ্জিনচালিত ট্রেনের এক স্বাতন্ত্র্যনির্দেশক 'পুল' থাকে - যেন কাদার উপর দিয়ে হড়কে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অনেকদিন ধরে ডিজেল ট্রেন চাপতে ইচ্ছে হচ্ছিল। স্টিম তো আর নেই, স্মৃতিমেদুরতা রেখে সে তো হাঁটা দিয়েছে না ফেরার পথে। তাই ডিজেলই সই। কিন্তু পাই কই? দক্ষিণ-পূর্ব রেলে হাওড়া থেকে ডিজেলচালিত ট্রেন এখন মাত্র দুটো, ১৮০০৭/১৮০০৮ হাওড়া-সিমলিপাল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ও ২২৮০৩/২২৮০৪ হাওড়া-সম্বলপুর সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস। দুর্ভাগ্যক্রমে দুটোর কোনোটাই যাওয়ার মতন নয়। পূর্ব রেলের সাহেবগঞ্জ লুপ লাইন হয়ে যাওয়া সব গাড়িই অবশ্য ডিজেলচালিত। কিন্তু উত্তরবঙ্গে কোথায় যাব এই ভরা বর্ষায়? হায় ডিজেল, তোমার দিন গিয়াছে।

আজকাল যখন কারও ডুয়ার্স যাওয়ার গল্প শুনি, একরাশ স্মৃতি মনে ভিড় করে আসে। চাকরি জীবনের শুরুতে, ১৯৮১ - ১৯৮৫, আমি ছিলাম উত্তরবঙ্গে। তখন মুঠিফোন ছিলনা, এমনি ফোনেও কারোকে ডাকতে হলে ট্রাঙ্ককল বুক করে তীর্থের কাক হয়ে ফোনের পাশে বসে থাকতে হত। একটা গাড়ি নিয়ে একবার অফিস থেকে বেরোতে পারলেই আর তোমাকে পায় কে! কোথাও তোমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে! এমনি ভাবেই তো পারুলবনের চম্পার সাথে চেনাজানা। তখন ডুয়ার্সে শখ করে বেড়াতে যাওয়ার লোক ছিল কম, জীবন ছিল অনেক শ্লথ, মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ। বায়ু মধু বহন করত, নদী-সিন্ধুসকল মধু ক্ষরণ করত। ওষধি-বনস্পতিসকল ছিল মধুময়। কত অচেনা অজানা অরণ্যে চা বাগানে কত দিন কত রাত কাটিয়েছি তখন। তারপরেই উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি।

-২-

অবশেষে দুর্গাপুরে। ঘড়িতে তখন দশটা। দুর্গাপুরে কলকাতার মত হলুদ ট্যাক্সি চলে, তাঁরা সার দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে। তাঁদের একজনকে ঠিক করা হলো। তিনি সবিনয়ে জানালেন, দেউল শ্যামারূপা কিস্যুটি চেনেন না, কারণ তাঁরা ভাড়া পান মূলত সেলস-এর লোকেদের; তবে 'চিন্তা

করবেন না, নিয়ে ঠিকই যাব।' তা তিনি গেলেনও, এবং দিনের শেষে দেখা গেল আমার সঙ্গে সারাদিনে ঘুরে, মন্দির-টন্দির দেখে তিনি অতিশয় প্রীত হয়েছেন। দুর্গাপুর স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে অনেক ধন্যবাদ জানালেন, বললেন আমার সৌজন্যেই তাঁর দেবীদর্শন হল। শহর ছাড়াতেই শাল সেগুন পলাশের জঙ্গল। কোনও শহরের এত কাছে অরণ্য দেখতে পাওয়াটা ভাগ্যের কথা। প্রথম গন্তব্য রাঢ়েশ্বর শিব, লোকমুখে যা আড়াশিব নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। শহর ছাড়িয়ে বনস্পতির ছায়ায় অনেকখানি ছড়ানো জমি নিয়ে মন্দিরটি অনেকটা উঁচু ভিতের ওপর, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরও কয়েকটি 'থান'। পিছনে বাবার বিল। শীতের কোথায় কি, এর মধ্যেই দ্বিচক্রযানারূঢ় বালকবৃন্দ বনভোজনে ব্যাপৃত। গেলে মনে হয় গাছের ছায়ায়, গাছের হাওয়ায়, বাবার মায়ায় দিনটা মন্দির চত্বরে শুয়েই কাটিয়ে দিই। তারপর অনেকখানি রাস্তা অরণ্যানী চিরে; মূল রাস্তা থেকে ডাইনে বেঁকে, গড়জঙ্গল রোড ধরে এঁকেবেঁকে, শ্যামারূপা মন্দির। ইস্কুলে উঁচু শ্রেণীতে আমাদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়তে হত। মঙ্গলকাব্যের একটা অংশ ছিল লাউসেনের কাহিনি। গোপরাজ ইছাইঘোষ স্থানীয় রাজা কর্ণসেনকে পরাজিত করে অধুনা বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গা অধিকার করে নিজেকে স্বাধীন গোপভূমির সার্বভৌম রাজা হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। পরের বছর কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন ইছাইঘোষকে হত্যা করেন। 'মুক্ত হৈল ইছাই জগতে জয় জয়।। সমরে গোয়ালা বীর পড়িল নিশ্চয়।। রণ জিন্যা বসিল দুর্লভ সদাগর।।' ইছাই ছিলেন দেবী চণ্ডীর ভক্ত। নিজের গড়ের মধ্যে মন্দির বানিয়ে সেখানে দেবীর পুজোর ব্যবস্থা করেন তিনি। মন্দিরটি বনের মধ্যে, অনেকখানি ছড়ানো জমি নিয়ে, বনস্পতির ছায়ায়; এবং এখানেও দ্বিচক্রযানারূঢ় যুবকবৃন্দ বনভোজনে ব্যাপৃত। ঢেউখেলানো জমিটির নাম শ্যামরূপার গড়। তবে কয়েকটি সিঁড়ি আর মাটির ঢিবি ছাড়া গড়ের আর কোনও চিহ্ন নেই। শ্যামরূপার মন্দিরটি নতুন। পুরোহিত মহাশয়ের কাছ থেকে যেটা জানা গেলো সেটা মোটামুটি এইরকম - অনেক অনেক বছর আগে এখানে ছিল এক কাপালিকের আস্তানা, তিনি নরবলি দিতেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেন (১১৭৮ - ১২০৬) বক্তিয়ার খিলজির দ্বারা গৌড় থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানে আশ্রয় নেন। তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন 'স্মরগরল খন্ডনং মম শিরসি মন্ডনং দেহি পদপল্লব মুদারম'-এর কবি জয়দেব। কেন্দুলি থেকে অজয় পেরিয়ে তিনি এই মন্দিরে আসতেন। প্রথম জীবনে দেবী চণ্ডীর সাধনা করতেন। পরে তিনি বৈষ্ণব হয়ে যান। ভক্তের ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে দেবী এই মন্দিরে তাঁকে 'শ্যামা'রূপে দেখা দেন। তাই দেবী এখানে শ্যামারূপা। কবি জয়দেব লক্ষ্মণসেনকে বলেন ওই কাপালিককে নরবলি থেকে নিরস্ত করার জন্য। লক্ষ্মণসেন কবিকে বলেন তিনি রাজাদেশ জারি করতে চান না, ভাল হয় যদি কবি জয়দেব শাস্ত্র থেকে প্রমাণ দিয়ে ওই কাপালিককে বোঝান, তারপরেও কাজ না হলে রাজাদেশের কথা ভাবা যাবে। কবি জয়দেবের সঙ্গে আলোচনায় কাপালিক তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। তিনি ওই আস্তানা ছেড়ে চলে যান। লক্ষ্মণসেন ওই জমির পত্তনি দেন তাঁর আশ্রিত সোমঘোষকে। সোমঘোষেরই পুত্র ইছাই ত্রিষষ্টিগড়ের মধ্যেই পৃথক ঢেকুরগড় স্থাপন করে নিজেকে স্বাধীন হিসাবে ঘোষণা করলে কাঁকসার জঙ্গল ঘেরা ত্রিষষ্টিগড়ের সামন্তরাজা কর্ণসেনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধে। হেরে যান কর্ণসেন; জয়ের নিশান হিসেবে ইছাইঘোষ দেউলটি গড়ে তোলেন। পরের বছর দুর্গাপুজোর সময় কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন ইছাইঘোষকে হত্যা করেন অজয় নদীর তীরে কাদুনেডাসায়। 'কাটা কন্ধ শ্যামরূপা কোলেতে করিয়া।। আপন দেউল মাঝে রাখে লুকাইয়া।। ... ইছাইঘোষের ঘর দেখি নারায়ণী।। আছাড় খাইয়া মহী পড়িল ঐমনি।। কপাট কাঞ্চন ঢাল ইছাইর ঘর।।...' ইছাইঘোষের মৃত্যুর পর মন্দিরের অধিকার বর্তায় বর্ধমানের রাজ পরিবারে। বিগ্রহের ওপরের ঢাকনাটি নিয়ে যান ইছাইঘোষের পালিতা কন্যা। তাঁর শ্বশুরালয় ছিল অধুনা পুরুলিয়া জেলার অন্তঃপাতী কাশীপুরে। বিগ্রহের ঢাকনাটি নিয়ে যাওয়ার পথে বরাকর নদীর তীরে হ্যাংলা পাহাড়ে তা অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পতিত হয়। কালক্রমে সেখানেই গড়ে ওঠে কল্যাণেশ্বরী মাতার মন্দির। তাই অদ্যাবধি এই মন্দিরে পূজা সাঙ্গ করতে হয় দ্বিপ্রহরের আগে, দ্বিপ্রহর থেকে পূজা শুরু হয় কল্যাণেশ্বরী মাতার মন্দিরে। তা বর্ধমানের রাজপরিবারের পরিচালনায় বেতনভুক পুরোহিত মহাশয়দের তত্বাবধানে মন্দিরের পূজাপাঠ চলছিল ভালই। গোল বাঁধল স্বাধীনতার পরে জমিদারি উচ্ছেদের সময়। বর্ধমানের রাজপরিবার মন্দির পরিচালনায় তাঁদের অপারগতা জানালেন। বংশানুক্রমিক পুরোহিত দেবীর রোষানলে পড়তে চাইলেন না। দৈনিক পূজা ও আতপ চালের ভোগ চালু রইল, বন্ধ হয়ে গেল দুর্গাপুজো, পায়সান্নভোগ। অর্ধশতাব্দী পরে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় সহযোগিতায় মন্দির তার লুপ্ত গৌরবের কিছুটা হলেও ফিরে পায়; মন্দিরের সংস্কার হয়, চালু হয় দুর্গাপুজো, পায়সান্নভোগ। মন্দিরের পাশেই মহর্ষি মেধাশ্রম। অনেকখানি জমি, অনেকগুলি মন্দির। মন্দিরে লোকজন পুণ্যার্থী দেখা গেল না, তবে রক্ষণাবেক্ষণের হাল দেখে বোঝা গেল আশ্রমের আর্থিক স্বাস্থ্য ভালো।

শ্যামারূপার মন্দির-মহর্ষি মেধাশ্রম থেকে শাল-অর্জুন-শিরীষ এবং বুনো গাছগাছালিতে ভরা গা ছমছমে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ চলে গেছে অজয়পাড়ের ইছাইঘোষের দেউলে। ইছাইঘোষ আর নেই, নেই তাঁর রাজ্যপাট; শুধু অজয় বয়ে চলেছে একইভাবে। শ'খানেক ফুট উঁচু মন্দিরের গায়ে জীর্ণ টেরাকোটার নকশা আজও বহন করে চলেছে অতীতের স্মৃতি। চারিপাশ ঘোর নির্জন। ও-পারে কবি জয়দেবের কেন্দুলি। এখানে সবিনয়ে একটি কথা জানিয়ে রাখা দরকার। পূর্ববর্তী বাক্যটি একটি বিবৃতি মাত্র, কোন দাবি নয়। কবি জয়দেবের জন্মস্থান তথা স্বত্বাধিকার নিয়ে বাংলা-ওড়িশার বিবাদ বিষয়ে আমি সম্যক অবহিত। ওড়িশা দাবি করে কবির জন্মস্থান খুরদা জেলায় প্রাচি নদীর তীরবর্তী কেঁদুলিশাসন গ্রামে। সেখানেও আমি গেছি। তাঁদের মতে কবির শিক্ষাদীক্ষা কোণার্কের নিকটবর্তী কুর্মাপটক গ্রামে। সেখানেও আমি গেছি, চন্দ্রভাগা সৈকতে জয়দেব পার্কও দেখেছি।

-৩-

অজয়কে দেখে মন ভাল হয়ে গেল। নীল আকাশের নিচে বালি, শরঘাস, মধ্যে মধ্যে চড়া। তার মধ্যেই অনেকখানি জায়গা বিছিয়ে বয়ে চলেছে সে ব্যস্ততাবিহীন। তবে এপার থেকে কেন্দুলি যাওয়া খুব একটা সহজ নয়। যাত্রা শুরু করার পর অনেকবারই মনে হয়েছে এভাবে না এলেই ভাল হত, বিশেষত একাকী ও এই বয়সে। এই ঘোর বর্ষাতেও অজয়ে খুব একটা জল নেই, এবং চড়া পড়ে যাওয়ায় ফেরিঘাটটি সরে গেছে অনেকখানি, প্রায় এক কিলোমিটার উজানে। ফলে বালির উপর দিয়ে সেই এক কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে নৌকায় উঠতে হবে, আবার ওপারে গিয়ে নৌকা থেকে নেমে এক কিলোমিটার ভাটিতে হাঁটতে হবে। ফেরাও একই পথে, অর্থাৎ মোট চার কিলোমিটার হাঁটা। উঁচু পাড় থেকে নদীবক্ষে নামার পথ অতীব খাড়াই, বর্ধমানপ্রান্তে যদিও বা শরঘাস ধরে কোনক্রমে নামাওঠা যায়, বীরভূম প্রান্তে শরঘাস নেই, খাড়াই পথটি নুড়িপাথরে আকীর্ণ, এবং নুড়ি সরে গিয়ে পপাত ধরণীতলে হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। সেও না হয় মেনে নেওয়া যেত, কিন্তু পড়ে গিয়ে কেটে-ছড়ে বাড়ি ফিরলে আর দেখতে হবে না, হয়ত এভাবে একা একা ঘোরাটাই বন্ধ হয়ে যাবে। বীরভূমপ্রান্তের এক কিলোমিটার হাঁটাপথের মধ্যে একটি ধারা এসে অজয়ে মিশেছে, সেখানে প্রায় হাঁটুজল। কিন্তু তাই বলে জীবন কি আর থেমে থাকে! ভটভট শব্দে নৌকা যাচ্ছে আর আসছে। নৌকায় পেরোচ্ছে মানুষ, সাইকেল, দ্বিচক্রযান, তিন চাকার ভ্যানরিকশা। আকাশ এখানে অনেকটাই নিচু হয়ে এসেছে জলে মুখ দেখতে, নিচে জল। হাঁটাপথের কষ্টস্বীকার না করলে জল মাটি আকাশের এই অনুপম রচনা কি দেখতে পেতাম!

অজয় পেরিয়ে ওপারে। জল পেরিয়ে খাড়াই বেয়ে যেখানে উঠলাম সেখানে রাস্তার দুপাশে সারি দিয়ে লোক বসে, গোঁসাইবাবার মন্দিরে আজ বাৎসরিক উৎসব, সেই উপলক্ষে নরনারায়ণ সেবা। গ্রামের মধ্যে দিয়ে পাকা রাস্তা ধরে কিছুটা হেঁটে গিয়ে জয়দেব মন্দির। চতুর্বর্গ রেখশিখর নবরত্ন মন্দিরটি পোড়ামাটির কাজ সমাকীর্ণ, বেশ বড়, অনেকখানি জায়গাজুড়ে উঁচু বেদির ওপর। পোড়ামাটির কারুকাজে বিষ্ণুর দশাবতার ও রামায়ণের কাহিনি। বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচাঁদ বাহাদুর ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে কবি জয়দেবের জন্মস্থান বলে বিশ্বসিত জমির উপরে মন্দিরটি নির্মাণ

করান।

অনেকক্ষণ লাগল মন্দিরটি ঘুরে ফিরে দেখতে। এবার ফেরা ওই পথেই। তবে একটা খটকা রয়েই গেল। বীরভূমপ্রান্তের কেন্দুলি বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম, পরপর আখড়া, আশ্রম, ইস্কুল, বড় বড় দোকানপাট, ডাক্তারের চেম্বার, প্যাথ ল্যাব... দেখে বোঝা যায় জায়গাটির আর্থিক স্বাস্থ্য ভাল। প্রতিতুলনায় বর্ধমানপ্রান্তের দেউল নেহাতই একটা ছোট গ্রাম, যেখানকার চায়ের দোকানের চা মুখে দেয়া যায় না। তবু সেখানে বীরভূমপ্রান্ত থেকে মানুষের, সাইকেলের, দ্বিচক্রযানের, তিন চাকার ভ্যানরিকশার অনর্গল আসাযাওয়া। এর অর্থনৈতিক চালিকাশক্তিটি কোনখানে সেটিই বোঝা গেল না।

ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে বাদলের ধারাপাত। বাপ্পা পাল ঘুরতে বেরোবে, আর বৃষ্টি হবে না তা কী করে হয়? ঈশ্বর ভদ্রলোককেও তো তাঁর অস্তিত্ব ও ক্ষমতা জাহির করতে হবে, নয়তো লোকে তাঁকে মানবে কেন! যদিও ভদ্রলোককে ইতোপূর্বে একবার বলেছিলাম নতুন কিছু ভাবতে; অস্তিত্ব জাহির করার তো আরও অনেক পন্থা আছে। এই ধরুন আপনি যদি আমাকে পঞ্চাশ কি একশো কোটি টাকা দেন তাহলে তো আপনার অস্তিত্ব আরও প্রবলভাবে জনচেতনাগোচর হয়, লোকে ধন্যধন্য করে, আপনার উদ্দেশ্য সাধিত হয়, আমারও কিঞ্চিৎ উবগার হয়। বললে বিশ্বাস করবেন না তাই শুনে ভদ্রলোক অবিকল গড়িয়াহাটের ফুটপাথের সেই কাচের বাসনওয়ালার মত জিভ কেটে বললেন, কি যে বলেন বড়দা, টাকাটাই কি জীবনের সব!!

অর্থের অর্থহীনতা নিয়ে কেউ জ্ঞান দিতে এলে বিরক্ত লাগে; কারণ অনেক ভেবে দেখেছি যে জীবনের কাছে আমার যা যা প্রত্যাশা, সবগুলোই টাকাসাপেক্ষ। আমার এক চাকরিতুতো দাদা বলতেন অর্থই জীবন, কারণ তাহা জীবনকে অর্থবহ করে; ক্রমিক নানাবিধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষকে জীবনের অর্থ উন্মোচনে উদ্বুদ্ধ করে; মৃত্যুকে বিলম্বিত করে জীবনকে দীর্ঘায়িত করে।

অন্য রাস্তা ধরে শহরের বুক চিরে শহরে ফেরা। সেই সুবাদে শহরটি দেখা হয়ে গেল। শহরে একটি সদ্য আবিষ্কৃত সপ্তদশ শতকের লুকানো সুড়ঙ্গমুখ দেখলাম, দুর্গাপুর নগর নিগমের হেরিটেজ কনজারভেশন কমিটি কর্তৃক সংরক্ষিত। তারপর দেড়শ পেরোনো ভিরিঙ্গি শ্মশানকালী মন্দির। তৎপরে এক সরাইখানায় মধ্যাহ্নভোজ।

বাকি রইল ভবানী পাঠকের টিলা ও দুর্গাপুর ব্যারেজ। বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল জানে আজকের কোনও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে বসে 'আনন্দমঠ' বা 'দেবী চৌধুরানী' লিখবেন না, মন্দ্রস্বর বেজে উঠবে না কোথাও 'আমি ভবানী পাঠক' বলে। তাই সে আর ভাবে না। গায়ের ওপর গড়ে উঠল এনার্জি পার্ক, বন্ধও হয়ে গেল, সে নির্বিকার। এবারে নতুন একটা কিছুর কাজ চলছে, সামনেই উদ্বোধন।

অজয়ের পর এবার দামোদরের সঙ্গে দেখা। ১৯৫৫-তে নির্মিত দুর্গাপুর ব্যারেজটি চৌত্রিশটি জলদরজা সম্পন্ন, ৬৯২ মিটার লম্বা, ১২ মিটার উঁচু। আকাশ মেঘলা, চরাচরে অনিঃশেষ বৃষ্টিপাতের শব্দ, পরিমণ্ডলে মায়ানমার থেকে উড়ে আসা নিম্নচাপ। মাইথন পাঞ্চেত বিপদসীমার ওপর, তাদের ছাড়া জল হহু ধেয়ে আসছে দামোদর বেয়ে, সঙ্গে ভেসে থাকা কচুরিপানার দ্বীপ, তিনটি বাদে সবকটি জলদরজা উন্মুক্ত। ব্যারেজপ্রাঙ্গণ বেড়াবার জায়গা হওয়া সত্ত্বেও এই দুর্যোগে কেউ কোথাও নেই। এই তো সময় নদীর সঙ্গে দেখা করার। অনেকক্ষণ বসে রইলাম সেখানে জল দেখতে। তারপর স্টেশনের পথে।

-৪-

ফিরতি যাত্রা প্রবাদপ্রতিম ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেসে। আগে তিনি ১৩৩১৮ ছিলেন, ২০১৩র জুলাইয়ে কুলীন হয়েছেন, সুপারফাস্ট হয়ে তাঁর নতুন পরিচিতি ২২৩৮৮। রেলগাড়িটি নিত্যযাত্রী ও পর্যটক উভয় মহলেই তুমুল জনপ্রিয়। ২১টি - মধ্যে মধ্যে ২৩টি কামরা নিয়েও তিনি সতত ভীড়াক্রান্ত। আমাদের শৈশবে শতাব্দী জনশতাব্দী, ইন্টারসিটিরা ছিলেন পিতার কনীনিকায় আলোকবিন্দু, তখন ইনি ও কোলফিল্ড ছিলেন কলকাতার সঙ্গে আসানসোল-ধানবাদ পশ্চাদভূমির একমাত্র যোগাযোগ। তবে ইনি এখন জলসাঘরের বিশ্বম্ভর রায়, শুধু রবিবারে রবিবারে শতাব্দী থাকে না বলে ওইদিন তাঁর আভিজাত্যবোধ প্রবল হয়ে ওঠে। দুর্গাপুরে এঁর সময় ১৮:২০, হাওড়ায় ২১:২০ - তিন ঘণ্টা, মধ্যে বিরতি পাঁচটি। প্রতিতুলনায় বিরতিহীন শতাব্দী হ্রস্বতর পথে দুর্গাপুরে ১৯:০০, হাওড়ায় ২১:১০। 'নামিল শ্রাবণসন্ধ্যা, কালো ছায়া ঘনায় বনে বনে॥ আনো বিস্ময় মম নিভৃত প্রতীক্ষায় যূথীমালিকার মৃদু গন্ধে' – যূথীমালিকারা না থাকলেও প্রতীক্ষাটি দীর্ঘায়িত হল, তিনি এলেন ছটা চল্লিশে, আমাদের কামরা সি-১ মাঝামাঝি, হাওড়ায় নেমে হাঁটতে হবে অনেকখানি। গাড়ি ছাড়ল, জানালায় শিল্পনগরীর আলোকে উদ্ভাসিত দিগন্ত। যাত্রীরা অধিকাংশই সুপ্তিমগন। শীতলতা পেরিয়ে কাচের দরজার ওপারে এক অন্য ভুবন, মুঠিফোনে উচ্চৈঃস্বরে ভোজপুরি গান বাজছে, মন দিয়ে শুনলে ও অর্থোদ্ধার করতে পারলে কান লাল হবেই। পানাগড় মানকর পেরিয়ে বর্ধমান। চা, ঝালমুড়ি। আকাশভাঙা বৃষ্টিপাতের মধ্যে হাওড়ায় ২২:১৫।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অডিট ও অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মী তপন পাল বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য। ভালোবাসেন বেড়াতে আর ছবি তুলতে। 'আমাদের ছুটি'-র জন্যই তাঁর কলম ধরা।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বঙ্গের উত্তরে

দেবাশিস রায়

~ *লামাহাটা-তিনচুলে-লেপচাজগতের আরও ছবি* ~

পায়ের তলার সরষেগুলো পুরনো হয়ে গেলেও বেড়ানোর নাম শুনলেই আমার গিন্নির মাথার পোকাগুলো নড়েচড়ে বসে। আর তা সংক্রামিত হতেও বেশি দেরি হয় না!
মাঝে ব্যয় সংকোচের নিমিত্তে "পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য" স্টাইলে পদব্রজে ভ্রমণ (ট্রেকিং) ধরেছিলাম, কিন্তু দু-এক দফা ঘুরতে না ঘুরতেই মাথা ঘুরে যাবার জোগাড়! গিন্নিও কম যান না, বলেন - সে কী? সপরিবার ভ্রমণ বাদ? বালাই ষাট! ক্ষতি পূরণে হাতের বালা, গিনির লকেট মায় কয়খান হাজারদুয়ারি শাড়ি; ব্যস - হাতে রইল ফাঁকা পকেট!!
তাই আবার রুট বদল। রং রুটে আর নয়!
কোন চুলোয় যাই, ভাবছি বসে দিন রাত। বরাবরের মতই খুব একটা মাপজোক আগে থেকে করা হয়ে ওঠে না। তার মধ্যেই যাতায়াত, থাকার ব্যবস্থাদি করে ফেলতে হবে। উৎসবের মাস (এখন অবশ্য বারো মাসই উৎসব), উৎসবের প্রাক্কালে আনন্দ ভাগ করে নেবার তীব্র বাসনায় মন আনন্দে পরিপূর্ণ, প্রাণে আরাম, হৃদয়ে প্রশান্তি; অথচ পকেটের ব্যাটারির (পড়ুন রেস্ত) চার্জ প্রায় তলানিতে।
তবু চুলোচুলি ঝুলোঝুলি করে মানচিত্র ছকে ফেলা গেল - লামাহাটা - তিনচুলে - লেপচাজগত, উত্তরবঙ্গের অল্প পরিচিত পাহাড়তলিত্রয়ী কেন্দ্র করে।

দুর্গোৎসবোত্তর প্রথম রবিবারে প্রাক্তনী বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে সান্ধ্যকালীন আড্ডা সেরে বরাদ্দ মিষ্টির প্যাকেট হাতে দে ছুট। লোকাল ট্রেনে শিয়ালদা পৌঁছানোর ফাঁকেই মিষ্টিমুখ।
ট্রৈনিক সফরে অকুস্থলে যাওয়ার এক্সপ্রেস গাড়ির পোষাকি নাম 'পদাতিক'! কী কান্ড। ওদিকে শিয়ালদাতে ব্যবস্থাপনায় স্টেশন ম্যানেজারের বোর্ডে 'আনন্দ বর্ধন' সাহেবের নাম দেখে আনন্দ বেড়ে গেল! এক্সপ্রেসে চেপে বার্থ খুলেই সটান শয়ান - আহ্ কি আরাম, এর নাম 'বার্থ' না হয়ে 'রিবার্থ' হলেও ক্ষতি কী!!

ঘুমের চাদর পাতলা হতেই কানে হালকা কোলাহল। ভোরের আলো এসে পিছলে পড়ছে চলন্ত গাড়ির ডাবল কাঁচের জানালায়, উলটোদিকে সেখানেই জটলা, জানলার পর্দা সরিয়ে উঁকি মারার সমবেত প্রয়াস। মই বেয়ে নেমে পড়া গেল। দুই লোয়ার বার্থের তলা থেকে এক-এক পাটি চপ্পল খুঁজে বার করে উল্লম্ব হলাম (ট্রেন কোচে চপ্পল বড় লোভনীয় বস্তু, রাতের বেলা অন্যের চপ্পল পায়ে গলিয়ে ভেস্টিবিউল সন্নিহিত ছোট কামরায় আবশ্যিক কর্ম সারতে যাওয়ার যাত্রী বন্ধুর অভাব নেই, তাই চপ্পল সুরক্ষিত রাখবার এই বিধি পালনীয়)।
একটাই টেনশন। সোজা হয়ে দাঁড়ালেও গরম চা পান করার ভরসা পাইনে। জানালার কাঁচে তখনও চুল না আঁচড়ানো মাথার ভিড়। তারই ফাঁক দিয়ে কর্ণার কিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতেই, চোখে ধাঁধা, হৃদয়ে কু ঝিক ঝিক। চলন্ত সবুজের সীমানা ছাড়িয়ে সামনের দৃশ্যপটে শুধুই পাহাড় - বরফ ঢাকা উন্নত শির। জঙ্ঘায় তার তুষার মণি কাঞ্চন, নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা!!
আহা, কি দেখিলাম, জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না!!
আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন নিউজলপাইগুড়ি ঢুকবে। এতবার উত্তরবঙ্গের এই প্রধান স্টেশনটি দিয়ে ট্রেনসফর করেছি, কিন্তু এ দৃশ্য আগে চোখে পড়ে নি। তাই যারপরনাই আপ্লুত, চোখে তৃষ্ণার আবাহন। ফলাফল, সকালের টেনশন গায়েব, তিন রুপিয়ার গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে উদার মনে ১০ টাকার নোট দিয়ে দেওয়ার সাহেবি মেজাজ! গিন্নি সেই ভোর বেলাতেই লোয়ার বার্থ ছেড়ে একপ্রস্থ লিপস্টিক আর আই লাইনারে চোখ রেখেছেন। এবার নামতে হবে যে, পাড়ি দিতে হবে পাহাড়ি পথ - যেখানে কয়েক রাতের জন্য আমাদের নাম লেখা আছে শৈলাবাসের বুকিং রেজিস্টারে।
মালপত্তর সব নামিয়ে পুঁটলি এবং পরিবারবর্গের মাথা গুণে সাহেবিয়ানা ঝেড়ে ফেলি। এবার আমি আর বন্ধুবর বিনে পয়সার কুলি। শ্রম লাঘবের জন্য মাথা খাটিয়ে প্রায় সব পুঁটুলির পশ্চাৎদেশেই চাকা লাগিয়ে এনেছি। চাকা আবিষ্কারের এমন সুফল আর কখনও অনুভূত হয় নি!
গাড়ি লাগবে? দাজ্জিলিন - জ্ঞানটক কোথায় যাবেন? ক'জন আছেন? হোটেল, ব্রেকফাস্ট? কী চান বলবেন তো! অহ, হোটেল গাড়ি বুক আছে!
হাসিমুখে পুরানো বন্ধু নবীন তার নতুন কেনা গাড়ি নিয়ে হাজির এনজেপি স্টেশন চত্বরে। মাত্র সতেরো দিন আগে হাতে পেয়েছে, এর মধ্যে সাত দিনের একটি সফর সেরে এসেছে কলকাতানিবাসী অন্য পার্টি নিয়ে। আমার সাথে সম্পর্কটি অবশ্য শুধুই পার্টি-ড্রাইভার নয় - অনেকটাই পারিবারিক। এ তল্লাটে নিয়মিত বেড়াতে আসা অনেকেরই এমন আত্মীয়তা তৈরি হয়ে আছে পাহাড়তলির ঘরে ঘরে, এখানে ওখানে। নবীনকে বুকে জড়িয়ে প্রাক শীতের সকালে বুক ভরে উষ্ণতা নিলাম। আমাদের ছয় মাথার ছয়দিনের একান্নবর্তী পরিবারে জায়গা হল আর এক আত্মীয়ের, ডুয়ার্সের সামসিংনিবাসী নবীন। সফরে সঙ্গী হল সাফারি। যাত্রা হল শুরু।
রেলস্টেশন জনপদ ছাড়িয়ে গাড়ি ছুটল সবুজ জঙ্গলের পেট চিরে কালো রাস্তা ধরে। যতদূর চোখ যায় শুধুই শাল মহুলের বন। শালুগোড়া হয়ে যাবো তিস্তাবাজার। দ্বিমুখী রাস্তায় মাঝে মাঝেই নীরবতা খানখান করে সাঁই সাঁই বেড়িয়ে যাচ্ছে বিপরীতমুখী গাড়ি। এভাবেই বেশ কিছুটা সময় এই বনপথে অতিক্রান্ত হবার পর তিস্তার পাড়ে প্রাতরাশের বিরতি।
আগের সপ্তাহেই বেশ কয়েকদিন ধরে অঝোরে বৃষ্টি হয়েছে, তিস্তার জলে তার ছোঁয়া, যদিওবা এখন রোদ ঝলমলে চারদিক। আকাশ নীল।
আমাদের জাঙ্গল সাফারির ক্ষণিকের ইতি। এবার উপোস ভঙ্গ - রাস্তার ধারে ধাবায়। সেখান থেকেই আড়মোড়া ভেঙে চোখ মেলা। এক পাহাড়ের ছায়ায় অন্য পাহাড়, কালো ধূসর রঙের বাহারি শেড, তারই আড়ালে উধাও সকালে ট্রেন থেকে দেখা সেই বরফঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা।
তিস্তাবাজার থেকে করোনেশন ব্রিজকে ডানহাতে রেখে তিস্তার পাড় ধরে ধরে রাস্তা এগিয়ে গেছে পাহাড়ি ধাপে। ঘন ঘন উচ্চতা বদলানোর সঙ্গে

সঙ্গে বদলাচ্ছে আবহাওয়া, পাহাড়ি বাঁকে পালটে যাচ্ছে ছবি। পাকদণ্ডী পথে ফেলে আসা রাস্তা, চা বাগান আর দীর্ঘদেহী ইউক্যালিপটাস আলো আঁধারির ছায়া গায়ে মেখে স্মার্টফোনের 'স্মৃতি' ভারাক্রান্ত করতে করতে চলেছে। এ পথ আমার অচেনা নয়। শুধু তার রঙ রূপ গন্ধ প্রতিবারই আলাদা মনে হয়। চেনা মানুষ অচেনা আবরণে আভরণে। পুরনো প্রেম ফিরে ফিরে আসে আনমনা চাহনিতে। গাড়ির চার্জারে ফোনের ব্যাটারি দম নেয়। কম্প্যাক্ট ডিস্কে মৃদুস্বরে বাজে, আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ...

পেশক রোড ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে এমনই এক টিপিতে পৌঁছানো গেল, যেখান থেকে নিচে তাকালে সরাসরি পাখির চোখে নৈসর্গিক জলছবি দর্শন। তিস্তা আর রঙ্গিতের আলিঙ্গন। সাধ করে ভিউ পয়েন্টের নাম রাখা হয়েছে "লাভার্স পয়েন্ট"। লাভার্স সামিটও হতে পারত। সেখানে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আবার রওয়ানা। সবে যখন আকাশ জুড়ে মেঘ জমেছে, ঝড় ওঠেনি, বাতাসটাতে ঘোর লেগেছে, তখনই হঠাৎ করেই পৌঁছে গেলাম প্রথম গন্তব্যে - তোরণে লেখা - আপনাকে লামাহাটায় স্বাগত!

রাস্তার ধারেই কিছু রিসর্ট আর হোম স্টে'র ব্যবস্থা। নিরিবিলি, ছিমছাম। পথ চলতে চলতে রাস্তার ধারে একটু জিরিয়ে নেওয়ার মতো। পাহাড়ের ঢালকে আঁচল করে রাস্তা থেকে নিচে পাথুরে কোলে দুই তল আর রাস্তা থেকে ওপরে দুই তল মিলিয়ে চারতলা রিসর্ট লামাহাটা রেসিডেন্সি, আধুনিক জীবনযাপনের সব উপকরণ নিয়ে হাজির। তিন দেওয়ালে ভর করে ছাদ, কাঞ্চনজঙ্ঘা ফেসিং অপর দেওয়ালে কাঁচের আচ্ছাদন। আকাশ পরিস্কার থাকলে ঘরে বসেই একশো আশি ডিগ্রি মনোবাসনা পূরণ। তখন বিকেল, উলটো দিকে সোনালি রোদ আলস্যে জড়িয়েছে দার্জিলিং পাহাড়ের ঘন বসতিপূর্ণ ইঁট কাঠ পাথরের বাক্সগুলোকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশের সব রঙ শুষে নিয়ে সূয্যি যাবে অস্তাচলে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে হাজার তারার আলোয় ভরা জোনাকগুলি উঠবে জ্বলে। কোথাওবা পাকদণ্ডী পথে তখনও জ্বলবে নিভবে একলা গাড়ির হেডলাইট, শেষ রাত ঘন কুয়াশার চাদরে মুড়ি দেবার আগেই তাকে পৌঁছতে হবে বাকি পথ।

এ জায়গাটার শান্ত স্নিগ্ধতা বৌদ্ধিক ধ্যানের মতই গম্ভীর, সার দিয়ে লাগানো বৌদ্ধমন্ত্র সম্বলিত উঁচু উঁচু পতাকার সারিতে বাতাসের শব্দ এখানকার নীরবতা ভাঙে, হাওয়ায় ভর করে নিঃশব্দে শান্তির বাণী ছড়িয়ে যায় গাছে গাছে পাতায় পাতায়, প্রাণ থেকে প্রাণান্তরে।

এরই উপকণ্ঠে বাস্তুতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রেখে বাস্তুভ্রমণের এক অখন্ড উদ্যোগ, সাহেবি নাম "ইকো-ট্যুরিজম", অল্প সীমানার মধ্যেই গাছে গাছে হাত ধরাধরি করে এক ফুলের বাগান, আঁকাবাঁকা পায়ে চলা পথ ধরে একটা সুদৃশ্য পার্কের আলপনা - লামাহাটা বিনোদন উদ্যান, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর মানসকন্যা - তাই চলতি নামে, "মমতা পার্ক" লামাহাটার অন্যতম আকর্ষণ।

গতকাল রাতেই ঘর থেকে পাহাড়ের বিপরীত প্রান্তে যে নিত্য দীপাবলির আয়োজন দেখেছিলাম, আজ দিনের বেলায় সেই কোলাহলে যাবার বাসনায় নবীনের সওয়ারিতে আবার সফর। গন্তব্য দার্জিলিং, এক ঘন্টার পথ, সারাদিন কাটিয়ে আবার ফিরে আসবো নিরালা সন্ধ্যায়, লামাহাটায়। এবারের দার্জিলিং অবশ্য অনেক পরিচ্ছন্ন, প্রশাসনিক তৎপরতায় ট্যুরিস্ট ভগবান, আতিথ্যে ত্রুটি নেই। ম্যাল-এর জায়ান্ট স্ক্রিনে ফ্রি টিভি চ্যানেল, পরিধিস্থ চেয়ারগুলো যথারীতি বরিষ্ঠ নাগরিকদের স্মৃতি রোমন্থনে অবসন্ন। তারই মাঝে চোখে পড়ে নতুন প্রজন্মের টাট্টুঘোড়ায় চেপে টগবগ টগবগ অথবা সাবানজলের ফেনার স্বচ্ছ গোলকের সার দিয়ে বাতাসে ভেসে চলা। এ ছবি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর অপরিবর্তনীয়। যেমন আজো পালটায় নি কেভেন্টারস-এর সসেজ আর অক্সফোর্ড-এর চেনা গন্ধ বা টয়ট্রেনের অমোঘ হাতছানি বাতাসিয়া লুপের চেনা অলিন্দে।

সারাদিন ঘোরাঘুরি করে যখন ফিরলাম তখন সন্ধ্যা সাতটা হবে। অর্ধেক লামাহাটা তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন, বাকি অর্ধেক চন্দ্রাহত - টোলখাওয়া চাঁদের কপালে টি দিয়ে, চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে। টেংরি কাবাব চিবোতে চিবোতে আমরাও সেই জোয়ারে স্নাত হলাম। অচেনা ফুলের গন্ধে আর ঝিঁঝিঁ পোকার কনসার্টে রাত হল মোহাচ্ছন্ন।
রাত পোহালেই কানে এল, বুদ্ধং শরণম গচ্ছামি - সঙ্ঘং শরণম গচ্ছামি। মৃদু স্বরে বেজে চলেছে ক্রমাগত, তারই অনুরণন ছড়িয়ে পড়ছে কাছে দূরে, পাহাড়ের ঢালে। নিচের বস্তিতে ডানা ঝাপটিয়ে মোরগ ডেকে উঠল বোধহয়, গা ঝাড়া দিয়ে উঠবার অ্যালার্ম।

আজ যাওয়া হবে "তিনচুলে"। খুব বেশি দূর নয় লামাহাটা থেকে। আধ ঘন্টা গাড়িতে। তবে এ রাস্তা মূল পথ থেকে গেছে বেঁকে, উপর পানে নুড়ি বিছানো সর্পিল গ্রাম্য পথে। দুই নম্বর গিয়ারে গাড়ি। নির্জন পথ। বেশ কিছুটা পথ চলে আসার পর বিপরীতমুখী একটা গাড়ি দেখতে পেলাম। বস্তা বোঝাই। নবীনের মুখে শুনলাম, ওগুলোতে আদা আছে। মনে পড়ল, আদার কারবারিরা নাকি জাহাজের খোঁজ রাখে না। এলাকাতে আদার চাষবাস হয় ভালোই। উপর থেকে নেমে আসা গাড়িটাকে জায়গা করে দিতে আমাদের গাড়িটা অনেকটা আগেই দাঁড়িয়ে গেল। পাহাড়ি পথে নিচে

নামার গাড়িকে আগে সুযোগ দিতে হবে। এটাই দস্তুর।
আরো কিছুদূর যাওয়ার পর একটা চাতালমত জায়গায় পৌঁছলাম। এখান থেকে নিচের ফেলে আসা পথটাকে দেখে ময়াল সাপের মত শুয়ে আছে বলে মনে হয়। কেউ কোথাও নেই। হাতে সময় অনেক। মোবাইলের সংযোগও বিচ্ছিন্ন। গাড়ি থেকে নেমে কিছু ছবি তুললাম। এই ক'দিনেই রিকু আর শুভ দারুণ বন্ধু হয়ে উঠেছে। ওরা গল্পে মেতে আছে। আমার বন্ধু এবং তার পরিবারও হয় কানে তার গুঁজে গানের দেশে, নয়ত বা আধোঘুমে। স্ত্রীকে দেখলাম এক জায়গায় বসে চুপচাপ স্থাণুবৎ। বিরক্ত না করে, আমিও বসে পড়লাম এক পাথরে। নিজের সাথে কথা। কতক্ষণ জানি না। নবীনের ডাকে সম্বিৎ ফিরলো, চলেঙ্গে সাব! চলো, চলো যাই। তিনচুলে।

এতক্ষণে জানা গেল, ফরেস্ট অফিস মারফৎ বুক করা তিনচুলের স্কাই হাই রিসর্টই আসলে "রাই রিসর্ট"। প্রাইভেট প্রপার্টি। বন দফতর বুকিং এজেন্সি হিসাবে পরিষেবা দেয়। সামরিক বিভাগের প্রাক্তনী রাই বাহাদুর গ্রামে ফিরে এসে ক্যান্টনমেন্টের মত করে এলাকাটা সাজিয়েজেন। গাছে গাছে চক্রাকারে মিলিটারি রঙের প্রলেপ। সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাইনের সারি, যেন বলছে - হে ক্ষণিকের অতিথি, আপনাকে অভিবাদন! টিলার মাথায় এক পাহাড়ি গ্রামে সুন্দর করে লতাপাতায়, নাম না জানা ফুলে আর গাছপালায় সাজানো এক শৈলাবাস। চারপাশ রৌদ্রোজ্জ্বল, ঝোপে ঝোপে সূর্যমুখী আনন্দে উদ্বেল। তার রঙ আর চমকে মাতোয়ারা মৌমাছির দল।

থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাটি আশাপ্রদ। হতাশার কারণ শুধু কিছু অনিয়ন্ত্রিত বে-আক্কেলে গেস্টস (ঘোস্ট বললেও কম বলা হয়), যারা আনন্দের আতিশয্যজনিত কারণে সপরিবারে নিজেদের মুখোশ খুলে দিয়ে গেল ঐ সাদাসিধে পাহাড়িয়া মানুষগুলোর সামনে। আজকাল বেড়াতে গিয়ে এ উৎপাত প্রায়ই চোখে পড়ে। বাধ্য হয়েই গভীর রাতে তাদের আনন্দে হস্তক্ষেপ করতে হল। তাতে কাজও হল। এসব ভূতেরা একটু ভিতুই হয়।

সূর্যোদয় দেখব বলে অন্ধকার থাকতেই উঠে পড়া। শাল জড়িয়ে চললাম টিলার মাথায় রিসর্টের গা দিয়ে পায়ে চলা পথে। সঙ্গী হল ইতিমধ্যেই আপন হওয়া ছয় মাসের অ্যালশেসিয়ান 'মেসি'। সূর্যোদয়ের আগেই আকাশ প্রতিভাত আবিরের রঙ ছড়িয়ে, দিগন্তে যখন উজ্জ্বল আলোক বিন্দু মাথা তুলছে, উল্টোদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে আলতো রোদের ছোঁয়া, দিনের প্রথম আলো তার মুকুটে। চোখের নিমেষে দৃশ্যপটে পরিবর্তন - আলোর গায়ে আলো, আঁধার সরিয়ে ধারে কাছের আবছা কালো পাহাড়গুলো দ্রুত পর্দা সরিয়ে ফেলছে, খাঁজে খাঁজে ঠিকরে পড়ছে আলোকচ্ছটা, কোলের কাছে সাদা মেঘের ঢেউয়ে প্রতিফলিত হয়ে তা ছড়িয়ে পড়ছে দিগদিগন্তে। এ এক নয়নাভিরাম ছবি, ক্যামেরা গুটিয়ে রাখলাম। লেন্সের শক্তি নেই প্রভাতের সে হোলিখেলাকে সে বন্দি করে। চোখ ভরে এঁকে নিলাম সেই দুর্লভ ঊষালগ্ন।
নরম রোদে অবগাহন শেষে নেমে আসার সময় খেয়াল করলাম, রাতজাগা সেই সহভ্রমণার্থীরা তখনও চুলায় আগুন জ্বেলে ঘুমের দেশে, তিনকূলে তাদের কেউ কোথাও নেই। সেইদিন সকালে রাই পরিবারের সকলের সাথে অনেকটা সময় কাটিয়ে ফেরার প্রস্তুতি। স্থানীয় প্রথামত গলায় উত্তরীয় পড়িয়ে রাই পরিবার বিদায় জানালো আমাদের, পরম আত্মীয়তায়। অকৃত্রিম আবেগে চোখের কোণাটা চিকচিক করে উঠল।

ওখান থেকে সরাসরি পথ নেমে গেছে গ্রামের মধ্য দিয়ে, তিস্তাবাজারের দিকে, বড়মাঙ্গোয়া হয়ে। আমরা উল্টোপথ ধরলাম। সারাটা পথ চুপচাপ । যাবো লেপচাজগত। পেশক রোড ধরে ঘুম হয়ে যেতে হবে মিরিকের পথে। ফেরার সময়েও লামাহাটা অতিক্রম করলাম আরো একবার। কিন্তু মন পড়ে রয়েছে তিনচুলেতে - ফেলে আসা খোলা জানলায়।

প্রায় বছরদশেক আগে একবার এসেছিলাম লেপচাজগত। চারপাশের পাহাড়ি বনভুমির মাঝখানে নিঃসঙ্গ এক বনবাংলো, বাহারি রডোড্রেনডন ঘেরা। একমাত্র চৌকিদার তার অতন্দ্র প্রহরী। সেখানে রাত্রিবাস ছিল এক শিহরণ। আজকের লেপচাজগতে ট্যুরিস্টদের চাহিদা মেটাতে বেসরকারী উদ্যোগে ইতিউতি গজিয়েছে কংক্রিট হোটেল। তবু বনবাংলোটি তার স্বকীয়তা বজায় রেখে একান্নবর্তী হয় নি। কার্পেটমোড়া বিশাল বিশাল ঘরে এখনও বনেদিপনার ছোঁয়া। বাইরের পলেস্তেরায় অযত্নের চেহারা প্রকট হলেও অন্দরমহল এখনও রক্ষণশীল। নির্ভেজাল আড্ডা আর অলস দুপুরে নির্জন বনপথে খানিক হাঁটাহাঁটি ক্লান্তি ঘুচিয়ে দেয়। বুক ভরে অক্সিজেন নিয়ে নেওয়া শহরের ধোঁয়াশ্রয়ে ফেরবার আগে।

এখান থেকেও কাঞ্চনজঙ্ঘা স্পষ্ট, আরো কাছাকাছিই মনে হয়। পরের দিনটা ধারেকাছে মানেভঞ্জন, সুখিয়াপোখরি, পশুপতি গেট (নেপালের

একটি প্রবেশপথ) হয়ে মিরিক ঘুরে এলাম। মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফু-ফালুট যাওয়ার ট্রেকিং পথে অনেকেরই চেনা। ঐ পথে "চিত্রে" গ্রামটি চিত্রাবৎ বললেও কম বলা হয়। এখানে রাস্তা ধরে এগোনোর সময় প্রায়ই চোখে পড়বে সীমা সুরক্ষা বল বা এসএসবি-র ক্যাম্প। রাস্তার একদিকে ভারতীয় সীমা, অন্যদিকে নেপাল ভূখন্ড। আবার পশুপতি গেট দিয়ে নেপালে ঢুকে কিছু কেনাকাটা পরিবারের মান ভঞ্জনের সহায়কও বটে।

মিরিক পৌঁছে মধ্যাহ্ন ভোজন। চারদিকে প্রচুর দোকানপাট, মানুষের ছড়াছড়ি। সবকিছু কেমন যেন অবিন্যস্ত। লেকের সৌন্দর্য গ্রাস করেছে মনোহারী দোকান আর রেস্তোরাঁর ভিড়। সবুজের দফারফা। শুধু একই আছে, লেকের বিপরীত প্রান্তে পাহাড়ের গায়ে সরু পথ বেয়ে গাছপালার ছায়াপথে একটানা যাতায়াত ঘোড়সওয়ারীর। কখনও ছোট বাচ্চা কোলে স্থূলকায়া, কখনোবা তরুণী তন্বীর। কাছেই আস্তাবলের বোঁটকা গন্ধ নাকে আসে। নাম না-জানা পাখি এসে ঘোড়ার গা থেকে পোকা খুঁটে খায়। ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘোটককুলের রেচনপদার্থ। দ্বিপদ প্রাণীদের জন্য অবশ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুলভ ব্যবস্থা। ইংরাজিতে বিজ্ঞপ্তি - 'শর্ট ৫, লং ১০ টাকা' এবং 'নো চেঞ্জ'।

ফেরার সময় রাস্তা সংলগ্ন ঢেউ খেলানো চাবাগিচায় হেলে পড়া আলতো রোদ্দুরে ফটোসেশন! কচ্ছপের পিঠের মতো উবু হয়ে আছে দুটি পাতা-একটি কুঁড়ি - চায়ের ঝোপ, সারি সারি। কনেদেখা আলোয় সেই বাগিচায় অন্ত্যমিল কবিতা উচ্চারণ। আজ রিকু আর ওর মাকেও খুব প্রাণোচ্ছল লাগছিল।

সূর্যাস্ত হতে না হতেই দিনের আলো নিভে এল। চারদিকে তখন আঁধার ঘনিয়েছে। গাছের মাথায় মাথায় চাঁদের উঁকিঝুঁকি শুরু হবে এবার। গাড়ির হেডলাইটের তীব্র আলো রাস্তায় বসানো দুপাশের হলুদ রিফ্লেক্টরে ঠিকরে পড়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে পাকদণ্ডী বেয়ে। বেলাশেষে খুব দ্রুতই পৌঁছে গেলাম রাতের আশ্রয়ে, লেপচাজগত। এদফায় পাহাড়ে আজই শেষ রাত।

লোটাকম্বল গোটানোই ছিল। এবার নামার পালা। পাহাড় থেকে। বন থেকে মন তুলে, কংক্রিটের জংগলে ফেরা। মংপো হয়ে ফিরবো ঠিক ছিল। রবীন্দ্র স্মৃতিবিজড়িত কুইনাইন ফ্যাক্টরির তৎকালীন কোয়ার্টার্স (রবীন্দ্র স্নেহধন্যা মৈত্রেয়ী দেবীর স্বামীর) আজ "রবীন্দ্র স্মৃতি ভবন"। সরকারি-বেসরকারি ঔদাসীন্যে অবহেলায় পড়ে থাকা এক "জাতীয় ঐতিহ্য"। স্থানীয় এক রবীন্দ্র-অনুরাগীর তত্ত্বাবধানে পুরাতন ব্যবহার্য আসবাবসহ রঙ তুলি কলম চাক্ষুষ করার সুযোগ, প্রবেশ মূল্য ছাড়াই। এলাকায় সৌন্দর্যবর্ধন এবং আলোকসজ্জার প্রচেষ্টা হয়েছে সরকারী আনুকূল্যে, কিন্তু তাতে পরিকল্পনার অভাব।

অশীতিপর নেপালিভাষী চৌকিদার শুদ্ধ বাংলায় গুনগুন গাইছেন, কেন তোমরা আমায় ডাকো... মনটা ক্ষণিকের জন্য বিষণ্ন হয়ে গেল। চৌকিদার বলে চললেন, এ পথে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী অনেকবার যাতায়াত করলেন। এখানেও এসেছিলেন। যত্ন করে বাঁধিয়ে রেখেছেন সেই ছবিও। রবি ঠাকুরের দালানে, যেখান থেকে আরাম কেদারায় বসে তিনি দৃষ্টি প্রসারিত করতেন নীল দিগন্তে।

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর!

অতঃপর রাতের ট্রেন ধরার জন্য দে ছুট। এবার দার্জিলিং মেল। ঘড়ি ধরে চলা। ট্রেন যখন শিয়ালদা ঢুকছে, উৎসবক্লান্ত কলকাতার তখনও ঘুম ভাঙে নি। হাল্কা কুয়াশার চাদর সরিয়ে দিনের আলো ফুটেছে। ঘরে ফিরলাম। সত্যিই কি ঘরে ফেরা? মনের কোণে স্বগতোক্তি, পুনর্মূষিক ভবঃ।

~ লামাহাটা-তিনচুলে-লেপচাজগতের আরও ছবি ~

'আমাদের ছুটি' আন্তর্জাল ভ্রমণ পত্রিকার অনেকদিনের বন্ধু দেবাশিস রায় ভালোবাসেন বেড়াতে। যুক্ত রয়েছেন বিভিন্ন এন জি ও-র সঙ্গে।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

স্বর্গরাজ্যের সপ্তহ্রদ

পর্ণা সাহানা

~ কাশ্মীর গ্রেট লেকস ট্রেকরুট ম্যাপ ~ কাশ্মীর গ্রেট লেকস ট্রেকের আরও ছবি ~

"অগর ফিরদৌস রুহে জমিন অস্ত্
হামিন অস্ত-ও, হামিন অস্ত-ও, হামিন অস্ত্ ...."

জীবনের প্রথম ট্রেক। ছোট থেকে কোনদিনই তেমন ডাকাবুকো প্রকৃতির ছিলাম না। স্কুলের স্পোর্টস ইভেন্টেও কোনও উল্লেখযোগ্য যোগদানের উদাহরণ নেই আমার। সেই আমি যাচ্ছি কিনা ট্রেকে? তাও আবার ১৪,০০০ ফুট উচ্চতায়? ভূস্বর্গ আমার জন্যে না জানি কী পসরা সাজিয়ে অপেক্ষা করছে!

৮ই জুলাই, ২০১৬: যাত্রা শুরু

অবশেষে সব জল্পনা কল্পনা, সব মানসিক প্রস্তুতি, হাঁটা প্র্যাকটিস করার কিছু বৃথা প্রচেষ্টা - সব কিছুর অবসান ঘটিয়ে এলো যাত্রা শুরুর দিন। সকাল ছটায় রওনা দিলাম দিল্লি এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে। পিঠে রুকস্যাক, পায়ে হাইকিং-শু, রুকস্যাকে বাঁধা হাইকিং পোলটাও উঁকি দিচ্ছে মাঝে মাঝে। নিজেকে বড় অচেনা লাগে যে! যথাসময়ে পৌঁছে গেলাম শ্রীনগর। সেখানে "Trek The Himalayas" (আমাদের ট্রেকিং সংস্থা)-এর গাড়ি অপেক্ষা করছে আমাদের সোনমার্গ বেস ক্যাম্প-এ নিয়ে যাওয়ার জন্য।

সোনমার্গ - সোনার তৃণভূমি। নাল্লা-সিন্ধ-এর তীরে অবস্থিত এই আলপাইন উপত্যকা যেন স্বর্গের প্রথম প্রবেশদ্বার। এখানেই এক ছোট প্রবহিনীর ধারে আমাদের বেস ক্যাম্প। চারপাশ পাহাড় ঘেরা। পায়ের নীচে সবুজ ঘাসের গালিচা আর মাথার ওপর সুনীল আকাশ। দুচোখের সামনে শুধুই অনাবিল সৌন্দর্য। চা-বিস্কুট সহযোগে ট্রেকলিডার নীতিনের ট্রেক ব্রিফিং এবং সহ-অভিযাত্রীদের সঙ্গে আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে শুরু হল অভিযানের প্রাথমিক পর্ব।

ধীরে ধীরে বিকেলের আলো ফুরিয়ে আসে। পাহাড়ের চুড়োগুলোতে লাগতে থাকে অস্তরাগের নেশা। তারপর কখন যেন ঝুপ করে কে আমাদের মুড়ে ফেলে ঘন অন্ধকারের চাদরে। পাহাড়ে রাত্রির একটা আলাদা রূপ আছে। চোখ বন্ধ করলে তা মর্মে মর্মে অনুধাবন করা যায়। আর চোখ খুললেই মাথার ওপর কোটি তারার শামিয়ানা। সময় যেন এখানেই স্তব্ধ হয়ে গেছে। না, পুরোপুরি থেমে যায়নি সে। তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায় ঝিঁঝির ডাকে, ওই খরস্রোতা নদীর কল্লোলে, আমাদের ঘিরে থাকা এই অলীক নিস্তব্ধতায়। রাত্রে টেন্টের ভেতর স্লিপিং ব্যাগে শুয়ে শুয়ে শুনতে পাই ঝমঝম বৃষ্টির মূর্ছনা। ঝলমলে তারাখচিত আকাশের মনে হঠাৎ এমন বাঁধভাঙা অভিমান ঢালল কে?

৯ই জুলাই, ২০১৬: সভ্যতার বন্ধন ছিন্ন হল

সকালে ঘুম ভাঙল যখন, আকাশের আর মুখ ভার নেই। টেন্ট থেকে বেরিয়ে দেখি সামনের পাহাড়ের কপালে উদয় ভানু তার প্রথম জয়টীকা এঁকে দিয়েছে। আজ থেকে আসল ট্রেকিং শুরু। সকাল ৮.১৫ নাগাদ আলু-পরটা আর চা সহযোগে ব্রেকফাস্ট সেরে হাঁটা শুরু হল। শুরুতেই একটা খাড়া চড়াই। তবে প্রথম দিন বলে উদ্যম আর উত্তেজনার অভাব নেই। ট্রেক-গাইডের উপদেশ মতো সোজা চড়াই রাস্তায় না উঠে আঁকা-বাঁকা জিগ-জ্যাগ পথে ওপরে ওঠা শুরু হল। এতে নাকি কষ্ট কম হয়। ওপর থেকে আমাদের ফেলে আসা ক্যাম্পসাইট, ছোট্ট নদী, পাহাড় ঘেরা সবুজ উপত্যকা আর তার বুকে TTH-এর নীল টেন্ট দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝে কিছু স্থানীয় শিশুদের টফি-র আবদার। ব্যাগে প্রচুর মাঞ্চ আর ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি নিয়ে বেরোনো হয়েছে, তাই ওদের সঙ্গে ভাব জমাতেও অসুবিধা হয় না।

আস্তে-আস্তে আমাদের ক্যাম্পসাইট আর দৃষ্টিগোচর হয় না। সামনে শুধুই নয়নাভিরাম সবুজ, আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরে সোনমার্গ-এর রূপশোভায় মুগ্ধ হওয়ার পালা। আজ আমরা সোনমার্গ এর ৭৮০০ ফুট-এর বেস ক্যাম্প থেকে পৌঁছব ১১,৫০০ ফুট-এর নিচনাই ক্যাম্পসাইট-এ। অর্থাৎ প্রায় ৪০০০ ফুট চড়াই পেরোতে হবে। আর বস্তুত: আজই আমরা নাগরিক সভ্যতাকে বিদায় জানাব আগামী সাত দিনের জন্য। মোবাইল নেটওয়ার্ক-ও থাকবে না এরপর। তাই সবাই একবার করে বাড়িতে কথা বলে নেওয়া হল। আমরা নিজেদের এবার সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিলাম প্রকৃতি মায়ের কোলে।

যত ওপরে উঠছি, পেছনে সোনমার্গ উপত্যকা ততই নিজেকে উন্মুক্ত করছে- নতুন আভরণে নিজেকে সজ্জিত করছে। দু-চোখে মুগ্ধতা নিয়ে এগিয়ে চলেছি। ম্যাপল- পাইন বনের সুগন্ধ ভুলিয়ে দিচ্ছে হাঁটার সমস্ত ক্লান্তি। পথে দেখা হল কয়েকজন আর্মি অফিসারের সঙ্গে। ওঁরা 'লং রুট পেট্রোলিং'- এর মাধ্যমে ভূ-স্বর্গের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করে চলেছেন। এভাবেই সাত-আট দিন এই উপত্যকা থেকে সেই উপত্যকা ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে ওঁদের।

শেকদুর-এর টেবল টপ-এ পৌঁছে আমাদের আজকের লাঞ্চ ব্রেক। সকালে প্যাক করে দেওয়া স্যান্ডউইচ আর ডিমসেদ্ধ সহযোগে খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওয়া হল। এখানে একটি দোকানও আছে। সেখানে ম্যাগি পাওয়া যাচ্ছে দেখে ম্যাগি-পাগলরা অবশ্য সুযোগ মিস করলনা মোটেই!

খাওয়ার পর্ব মিটলে আবার শুরু হল হাঁটা। আশার কথা এরপর আর চড়াই নেই তেমন। রূপোলি বার্চ-এর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নামছি। নীচে নদীর স্রোতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেই শব্দই আমাদের লক্ষ্য। নদীর কাছে পৌঁছে দেখি সে কী অপূর্ব রূপ তার! কী এক মাতাল খুশীতে উত্তাল সে! প্রবল স্রোত যেন সেই পাগল করা উচ্ছাসেরই বহি:প্রকাশ। এমন সাদা রং আগে দেখেছি কি? এই পাগলিনীকে সঙ্গী করেই বাকি পথটুকু পেরোব আমরা। এ এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। নদীর শব্দটুকুর বাইরে আর কোনও শব্দ কর্ণগোচর হয়না। প্রকৃতিকে এমন ভাবে কাছে পাওয়ার, এমন ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সুযোগ আগে কখনও আসেনি। পাহাড়ে আগেও বেড়াতে গেছি বহুবার। কিন্তু সমস্ত নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য, যাবতীয় আধুনিক প্রযুক্তি থেকে মুক্ত হয়ে তাকে এমনভাবে আলিঙ্গন করার সৌভাগ্য আগে কখনও হয়নি। হাঁটার ক্লান্তিতে হাঁপিয়ে গিয়ে নিজের জোরে নি:শ্বাস ফেলার শব্দটাও যেন রূঢ়ভাবে কানে বাজে, নিজেকে অপরাধী মনে হয়!

সোনমার্গ বেসক্যাম্প

হেঁটেই চলেছি, রাস্তা যেন আর শেষ হয়না! অভিষেক, সম্বিতদা, আর সাত্যকি তাদের ফোটোগ্রাফি নিয়ে ব্যস্ত। আর আমি ভাবছি কখন আসবে আমাদের ক্যাম্পসাইট? অবশেষে একরাশ ক্লান্তি নিয়ে পৌঁছলাম নিচনাই ক্যাম্পসাইট। তবে ট্রেকলিডার নীতিনের কড়া নির্দেশ টেন্টে ঢোকা চলবে না। এই জায়গাটাও অসম্ভব সুন্দর। আসলে পানীয় জলের সুলভ প্রাপ্যতার জন্য প্রতিটি ক্যাম্পসাইট নদীর ধারেই বাছা হয়। আর তাতেই সৌন্দর্য্য যেন কয়েকশ গুণ বেড়ে যায়। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আড্ডা, ছবি তোলা- এসবের মধ্যে দিয়ে সময় কেটে যায় কখন। চা, সুস্বাদু স্যুপ - একে একে দিয়ে যাচ্ছে কিচেনস্টাফরা। পড়ন্ত বেলায় নদীর জলে এক মায়াবী রঙের ছায়া মিশছে। সেই মায়ায় মিশে যাচ্ছি আমরাও - ভেসে যাচ্ছি... হারিয়ে যাচ্ছি....

নিচনাই ক্যাম্পসাইট

১০ই জুলাই, ২০১৬: নিচনাই পাস অতিক্রমের পরীক্ষা

সকাল থেকেই আকাশের মুখ গোমড়া। এদিকে আজই এই ট্রেকের প্রথম পাসটা পেরোতে হবে। নিচনাই পাস, ১৩,১০০ ফুট উচ্চতায়। নিচনাই পাস-ই হল সপ্তহ্রদ-এর প্রবেশ দ্বার। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর - এই সময়টুকুই পার হওয়া যায়। বাকি সময় সম্পূর্ণ বরফে ঢেকে থাকায় চলাচলের অযোগ্য। এই কারণেই কাশ্মীর গ্রেট লেকস ট্রেক রুটটিতেও এই তিন মাসের জন্যেই ট্রেকারদের অধিকার। বছরের বাকি সময়টা পাহাড় আর প্রকৃতির নিজস্ব, ব্যক্তিগত। এই দীর্ঘ বিরহই হয়ত পাহাড়প্রেমীদের মনে জাগিয়ে তোলে আরও তীব্রতর আকর্ষণ। বাধ্য করে নতুন করে তার প্রেমে পড়তে। সেই নিখাদ প্রেম যে একবার আস্বাদন করেছে, তার পক্ষে অসম্ভব সেই নির্মোঘ হাতছানি উপেক্ষা করা।

অভিমানী আকাশকে সঙ্গী করেই বেরোনো হল। ব্রেকফাস্ট সেরে নেওয়া হয়েছে ক্যাম্পেই। শুরুতে বেশ লম্বা একটা চড়াই অতিক্রম করার চ্যালেঞ্জ সামনে। যদিও অধিকাংশ সহযাত্রীদের দম এবং হাঁটার গতি ঈর্ষণীয়। কি জানি, তারা দুটোর বেশি ফুসফুসের অধিকারী কিনা! তাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সামর্থ্য আমার নেই। হয়ত তাগিদও নেই তেমন। আমি মুগ্ধ হতে চাই, প্রকৃতির রূপসুধা পানে নিজেকে ধন্য করাতেই আমার আগ্রহ। স্বভাবত:ই কিছুদূর এগিয়েই দাঁড়াই, বুক ভরে শ্বাস নিই, আর তাকিয়ে দেখি ফেলে আসা পথটা। অভিষেকরা যথারীতি ছবি তোলে, আমি শুধু দু'চোখ ভরে দেখি। মনে মনে বলি, তোমাকে কখনও ভুলব না, কিন্তু পাহাড়, তুমিও কি মনে রাখবে তোমার এই মুগ্ধ প্রেমিকাকে?

মাঝরাস্তায় বৃষ্টি শুরু হল। সামনে একটা চওড়া গ্লেসিয়ার। বরফের ওপর দিয়ে এতটা রাস্তা হাঁটার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। তার ওপর বৃষ্টি হয়ে জল কাদায় আরও পিচ্ছিল হয়ে গেছে পথ। গোড়ালি ঠুকে ঠুকে গ্রিপ তৈরি করে স্টিকের সাহায্যে এগিয়ে যেতে হবে। প্রতি পদক্ষেপে পিছলে যাওয়ার আশঙ্কা। সামনে টিমের কনিষ্ঠতম সদস্য সাত্বত, অনায়াসে এগিয়ে চলেছে। অগত্যা, নিজের মান বাঁচাতে আমাকেও যেতেই হবে। সাহস সঞ্চয় করে এগোতে থাকলাম।

নিচনাই পাস পেরোনোর পর

এই প্রসঙ্গে সাত্বত-র কথা একটু বলি। সম্বিতদার ছেলে। ন বছর বয়েসে এটা ওর চতুর্থ ট্রেক! প্রথম ট্রেকে যায় দুবছর বয়সে, পোর্টারের পিঠে চেপে। বাবা-মা দুজনেই ট্রেক পাগল বলে ছোট থেকেই এই সৌভাগ্যের অধিকারী। উদ্যম এবং গতিতে যেকোনও পূর্ণবয়স্ক লোককে টেক্কা দিতে পারে। এবারে ট্রেকটা পুরোটা হেঁটে শেষ করার শর্ত বাড়ি গিয়ে কেএফসি-র চিকেন পপকর্ন খাওয়াতে হবে!

বেশ কয়েকবার আছাড় খেয়ে, পা পিছলে গ্লেসিয়ার পেরিয়ে এলাম। কয়েকজন তো না হেঁটে স্লাইড করে নিল কিছুটা। বৃষ্টির জন্যে ঠান্ডাও বেড়েছে। পাসের ওপর হাওয়ার দাপটও প্রবল। কোনরকমে পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাত গরম করার চেষ্টা করছি। নিচনাই পাস যেন একটা বিশাল গহ্বরের উন্মুক্ত অবতল মুখ। চারপাশে তুষারশৃঙ্গ পর্বতে ঘেরা। পাস অতিক্রম করার চ্যালেঞ্জে পাস করার পর উতরাই এর পালা। বৃষ্টির জন্যে রাস্তা অল্প পিছল হয়ে আছে। পা পিছলে গেল দু-এক বার। সামনের নিচনাই ভ্যালিটায় ছোট ছোট পাহাড়ি ফুলের পসরা। একটা নদীর ধারে বসে বিস্কুট, চকলেট খেয়ে, জলের বোতলে জল ভরে আবার হাঁটা লাগালাম। সম্বিতদা ছবির জন্যে মাঝে মাঝেই যেখানে সেখানে চলে যাচ্ছে। একবার তো কাদায় পা এমন ভাবে ঢুকে গেল যে আর বেরোতেই চায় না। পা যদিও বা বেরোল, জুতো থেকে গেল কাদার মধ্যেই। শেষে হাতে করে টেনে বার করতে হল, জুতো তখন কাদায় মাখামাখি। এরকমই হাসি-মজায় পৌঁছলাম ক্যাম্পে। গরম গরম ভাত, ডাল আর স্যালাড আমাদের অপেক্ষায়। আয়োজন সামান্য হলেও খিদের মুখে তার স্বাদই যেন অমৃত!

বিষ্ণুসর-এর পাড়ে

বিষণসার বা বিষ্ণুসর গ্রেট লেকস এর অন্যতম। ক্যাম্প থেকে লেক অবশ্য কিছুটা দূরে। বিকেলের দিকে আমরা গেলাম লেকের ধারে। সে এক অদ্ভুত শান্তির জায়গা। চারপাশে পাহাড়, মাঝখানে প্রায় গোলাকার লেক, শান্ত নীল জল, যার থেকে নীলম নদীর উৎপত্তি। এই বিষণসার একটি oligotrophic লেক, তাই শ্যাওলাহীন জল কাচের মত নির্মল, স্বচ্ছ। চারধারের পর্বতবেষ্টনীর প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই জাতীয় লেকের নিচের অংশে অক্সিজেন এর পরিমাণ বেশি হওয়ায় প্রচুর মাছও থাকে এখানে, বিশেষত: ট্রাউট। এখানে মাছ ধরার জন্যে আগে থেকে অনুমতি নিতে হয় রাজ্য সরকারের মৎস্যকল্যাণ দপ্তর থেকে। আমরা পৌঁছে দেখলাম বেশ কিছু মৎস্য-শিকারীর ভিড় লেকের কাছে, ট্রাউটের আশায়। আমাদের বাঙালির জিভ, মাছের নামেই সিক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু খাওয়ার তো কোনও উপায় নেই। অগত্যা ফিরে আসতে হয়। আশেপাশের তৃণভূমিতে যত্রতত্র ভেড়ার পাল চরে বেড়াচ্ছে তখন। অলস বিকেল এভাবেই কেটে যায়। রাত্রি নেমে আসে... আরও একটি দিনের আশা জিইয়ে রেখে।

১১ই জুলাই, ২০১৬: নৈসর্গিক কৃষ্ণসার

গত রাত্রেই ট্রেকলিডার নীতিন বলে রেখেছে আজকের কঠিনতম রুট-এর কথা। তবে গত দু দিনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ যাত্রীরা আজ আর উদ্বিগ্ন নয় এ নিয়ে। বেশ খোশ মেজাজেই সবাই যাত্রা শুরু করলাম। ক্যাম্পসাইট থেকে ঘন্টাখানেকের হাঁটা পথের পর পৌঁছলাম কৃষ্ণসার লেকের ধারে। এই লেকটির সৌন্দর্য বাধ্য করে নিমেষে তার প্রেমে পড়তে। লেকের সামনে একটা খাড়া রিজ, তার গায়ে সর্পিল রেখা যেন এঁকে দিয়ে গেছে কেউ। রিজটা এতটাই খাড়া যে বিশ্বাসই হতে চায় না হেঁটে এর চূড়ায় ওঠা যায়! বস্তুত: সেটাই তখন আমাদের সহযাত্রীদের ঠাট্টার বিষয়বস্তু, কে উঠবে ওই রিজ-এর চূড়ায়? এমন সময় নীতিন এসে দিল সেই ভয়ংকর সংবাদ! আমাদের ওই রিজ-এর চূড়াতেই পৌঁছতে হবে। ওই সর্পিল রেখাগুলিই আমাদের হাঁটার ট্রেইল। অগত্যা, চড়াই শুরু হল।

যত ওপরে উঠছি, কৃষ্ণসার ততই মোহময় হয়ে উঠছে। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছি কিভাবে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে জলের রং। সে এক অদ্ভুত নীল। আর সেই নীল জলের বুকে ছোট্ট একটি পাথর, সবুজ শ্যাওলায় ঢাকা। এমনই নৈসর্গিক তার রূপের ব্যঞ্জনা, চোখ ফেরাতেই পারি না আমি। আরও কিছুটা ওঠার পর বিষণসারও দেখা গেল কৃষ্ণসার এর পিছনে। রিজ-এর চূড়া অবধি ওঠার কষ্ট বিন্দুমাত্র বুঝতে দিল না এই দুই লেকের যুগ্ম সম্মোহন।

এর পরের গন্তব্য এই ট্রেক-এর উচ্চতম স্থান, গাদসার পাস, ১৩,৭৫০ ফুট উচ্চতায়। রাস্তা বলতে মানুষের পা আর ঘোরার ক্ষুরে তৈরি হয়ে যাওয়া চিহ্ন, তাই অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে হবে। আমার মত ফার্স্ট টাইম ট্রেকারের জন্য পথটা যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। তবে আবারও প্রকৃতির অতুলনীয় সৌন্দর্য্য সব কষ্ট লাঘব করে দেয়। গাদসার পাস-এর মাথায় পৌঁছনোর পর আত্মবিশ্বাস আরও কিছুটা বেড়ে গেল। নিজের সাফল্যে যেমন গর্ববোধ হয়, তেমনই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে পাহাড়ের এই বিপুল বিস্তৃতির সামনে। একমাত্র পাহাড়ই পারে এমনভাবে অবলীলায় মন থেকে অহংকারের পর্দা ছিঁড়ে ফেলতে। মনের যাবতীয় ক্ষুদ্রতা সব মুছে যায় এর পায়ের তলায়। শহুরে আড়ম্বর, অনাবশ্যক সংস্কার, সঙ্কোচ সব কোথায় হারিয়ে যায়। এখানে সবাই সমান, সবাই ভীষণ নগণ্য এই মহান বিশালতার কাছে।

গাদসার পাসের নিসর্গ

গাদসার পাস থেকে গাদসার লেকের রাস্তাটা বর্ণনাতীত সুন্দর। মাইলের পর মাইল জুড়ে যেন বসেছে ফুলের মেলা। প্রকৃতি যেন আমাদের স্বাগত করার জন্য পুরো রাস্তাতেই বিছিয়ে রেখেছে রংবেরং এর ফুলের গালিচা। রাস্তার মাঝে মাঝে অনামী আরো কিছু লেক। অল্প বরফও ভাসছে লেকগুলির জলে। এই রাস্তা ধরেই এলাম গাদসার লেকের ধারে। লেকটির অবস্থান ও মায়াবী রূপ দীর্ঘ পথশ্রান্তি দূর করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। গাঢ় ফিরোজা নীল জলে ছড়ানো ছিটানো বরফের টুকরো। লেকের জল গিয়ে মিশছে একটি নদীতে। নদীগুলিও যেন এই নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্য দেখে মাতোয়ারা। তবে এই মনমাতানো রূপের পেছনে আছে কিছু কাহিনিও। কাশ্মীরি ভাষায় এই লেকের অপর নাম যমসার বা মৃত্যুহ্রদ। স্থানীয় মেষপালকদের বিশ্বাস এই লেকে বাস করে এক দৈত্য যার আকৃতি অক্টোপাসের মত এবং সে তার শুঁড় দিয়ে ভেড়াদের টেনে নেয় লেকের গভীরে। তাই তারা লেকের ধার পারতপক্ষে মাড়ায় না। জানিনা আমাদের ট্রেক গাইড ইজাজ ভাইও এই কাহিনিতে বিশ্বাস করে কিনা। দেখলাম সেও লেকের ধারে না এসে নদীর ধারেই বসে থাকল। তার সঙ্গে টীমের অধিকাংশ সহযাত্রীরাও। শুধু আমরা ৬ জন (নাকি সাড়ে পাঁচ, সাত্বতকে কি পূর্ণবয়স্কদের দলে ফেলা যায়? যদিও অভিজ্ঞতায় সে আমাদের অনেকের থেকেই এগিয়ে!) বাঙালিই লেকের ধারে এক উঁচু পাথরের প্ল্যাটফর্মে বসে সেরে নিলাম আমাদের লাঞ্চ, প্রকৃতির শোভা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করতে করতে।

এরপর যেন আর শরীর চলতে চায় না। নীতিনের বলা কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে; মনে শুধু একটাই চিন্তা যে কখন আসবে ক্যাম্পসাইট? মাঝে এক জায়গায় আর্মি চেকপোস্টের প্রথামাফিক চেকিং সেরে নেওয়া। সেখানেও আবার ট্রাউটের লোভনীয় গল্প। অতিকষ্টে বাকি রাস্তাটুকু পেরিয়ে ক্যাম্পে গিয়ে গা এলিয়ে দেওয়া হল। স্যুপ খেতে খেতে আড্ডা দিয়ে কেটে গেল বিকেলটা। অভিষেকরা ক্রিকেট খেলারও আয়োজন করল খানিকক্ষণ। আরও একটা দিন কেটে গেল অভিজ্ঞতার ঝুলি সমৃদ্ধ করে দিয়ে।

সন্ধেবেলা এক অতর্কিত দু:সংবাদ। শ্রীনগরে নাকি কারফিউ জারি হয়েছে। পরিস্থিতি খুবই আশঙ্কাজনক। বিস্তারিত তথ্য জানার কোনও উপায় নেই। শুধু আমাদের একদিন পর ট্রেক শুরু করা টীমের মুখে শুনে যেটুকু জানা যায়। তাতে গল্প অতিরঞ্জিত হচ্ছে কিনা যাচাই করার উপায়ও কিছুই নেই। বেশ চিন্তা হতে লাগল। পরিস্থিতির আঁচ কিছু তো টের পাচ্ছি না, কিন্তু না জানি বাড়িতে এই খবর শুনে কি অবস্থা! পরে নীচে নামার পর আস্তে আস্তে জেনেছি হিজবুল মুজাহিদিন নেতা বুরহান ওয়ানির মৃত্যুকে ঘিরে এবারের গন্ডগোলের সূত্রপাত। ভুস্বর্গকে নরক বানানোর এই বীভৎস খেলা কবে বন্ধ হবে?

১২ই জুলাই, ২০১৬: প্রকৃতির রূপের পসরা

আজ সকাল থেকেই আকাশ ঝলমলে। আর তাতে রূপসী প্রকৃতি যেন আরও অনুপমা হয়ে উঠেছে। আজ প্রথমেই পেরোব একটা বরফের ব্রিজ। এখানে নদীর জল জমে বরফ হয়ে থাকে বছরের অধিকাংশ সময়ে। জুলাই থেকে বরফ আস্তে আস্তে গলতে শুরু করে। এখন কয়েকফুট পুরু বরফের নীচে জল উঁকি দিচ্ছে। আর এই পুরু বরফের স্তরই আমাদের নদী পেরোনোর ব্রিজ। এই বরফ সেতু পেরোনোর পর সামনে বেশ চড়াই রাস্তা। তবে পুরো রাস্তাতেই সৌন্দর্য এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে - পাহাড়ে, খরস্রোতা নদীতে, পাইন গাছের সারিতে, রংবেরং এর পাহাড়ি ফুলে - যে ক্লান্তি বা অবসাদ কোনটাই আমাদের গ্রাস করার অবকাশ পায় না। আকাশ খুব পরিষ্কার ও মেঘমুক্ত থাকায় নাঙ্গা পর্বত, যা পাকিস্তানে অবস্থিত, তার শৃঙ্গ দেখার সৌভাগ্য হল। প্রকৃতি তো আর মানুষের মত LOC-এর বিভাজন মানে না। অনায়াসে ধরা দিতে পারে প্রকৃতিপ্রেমীদের মুগ্ধ চোখে - স্থান, কাল, দেশের সীমানা ছাড়িয়ে।
আজ অভিষেকের জন্মদিন। উপহার তো প্রকৃতিই সাজিয়ে রেখেছে রাশি রাশি। ১১,০০০ ফুট উচ্চতায় জন্মদিন কাটানোর সুযোগটাই তো একটা বড়সড় সেলিব্রেশন! তবুও আর্মি ক্যাম্পে চেকিং-এ যাওয়ার আগে সুযোগমত তুলে নিলাম কিছু ঘাসফুল। গোলাপী, নীল, সাদা, বেগুনী - কতই না তার রঙের বাহার! আমার উপহার তো এমনটাই, আমার মতই, সাধারণ কিন্তু আন্তরিক। আর পাহাড়ের আভিজাত্যও এমনই, যে দেখনদারির বাহুল্যতা এখানে বড়ই খেলো হয়ে যায়। সেই আভিজাত্য এমন সম্ভ্রম জাগিয়েছে যে ব্যাগে করে আনা কাজলের স্টিকটা এই কদিনে একবারও বার করার ইচ্ছে হয়নি। পাহাড় যেন সমস্ত বাহুল্য আভরণ এক এক খুলে ফেলতে শেখাচ্ছে। শেখাচ্ছে অন্তরের অন্তরতম "আমি" টাকে খুঁজে পেতে, সব বাহ্যিক আবর্জনা ফেলে দিতে।

দীর্ঘ পথের শেষে ক্যাম্পসাইট-এর দেখা পাওয়াটাই যে কি মধুর! তবে এখানে আমাদের ক্যাম্প সাতসারের জোড়া লেকের ধারে নয়। লেকের দর্শন পেতে যেতে হবে মেন্গেন টপ। বেশ দুর্গম রাস্তা। তার ওপর বেশ লম্বা ছিল আজকের পথটা। তাই এখন সবাই গা এলিয়ে দিয়েছে। আরও ওপরে যাওয়ার আর কারোরই বিশেষ ইচ্ছে নেই। আমিও গোড়ালিতে চোট পেয়েছি একটু। এদিকে আরও দুদিনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া বাকি আছে এখনও। তাই আর ঝুঁকি নিলাম না। শুধু সম্বিতদা আর সাত্যকি গেল। সন্ধেবেলা মোমবাতি জ্বালিয়ে আর হ্যাপি বার্থডে গান গেয়ে অভিষেককে শুভেচ্ছা জানানোও হল। রাত নামার সঙ্গে শুরু হল আগামীকালের জন্যে মানসিক প্রস্তুতি।

১৩ই জুলাই, ২০১৬: দুর্গম বোল্ডারের মরণ-ফাঁদ

পাহাড়ে আবহাওয়া বড্ড অভিমানী আর খামখেয়ালী। তার মনের গতি বোঝা বড়ই শক্ত। আজ সকালে আবার আকাশের মুখ ভার। বৃষ্টিও হচ্ছে মাঝে মাঝে। আর এদিকে আমাদের সামনে বোল্ডারের সমুদ্র! সেই বোল্ডারদের চেহারাও দেখার মত! বসে, লাফিয়ে, গড়িয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে - না জানি আরও কী কী ভাবে পার হচ্ছি আমরা! প্রতি পদক্ষেপে ঝুঁকি। আমি তো একবার পাহাড়ের ঢালে গড়িয়েই যাচ্ছিলাম প্রায়। নরম মাটি, আঁকড়ে ধরার মত কিছুই নেই, শুধু কিছু আলগা পাথর ছাড়া। সেগুলো ধরতে গেলেই আরও গড়িয়ে যাচ্ছি। অবশেষে নীতিন এসে হাত ধরে তুলল আমাকে। এই সব কিছুই অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ বাড়িয়ে দিচ্ছে অনেক গুণে। কষ্ট করার, কষ্ট সহ্য করার যে একটা অদ্ভুত আনন্দ আছে, সেটা আজ বুঝলাম। সেই আনন্দ যেন নেশার মত আচ্ছন্ন করছে। মনের অবচেতনে লুকিয়ে থাকা এক গোপন মন চাইছে এই বোল্ডারের রাস্তাটাই চলতে থাকুক আরও!

সাতসরের পথে

এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও রেহাই নেই। আবার খাড়া রিজ সামনে। রিজে উঠতে উঠতে সামনে দেখছি কিভাবে মেঘের আস্তরণের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে নাম না জানা এক উঁচু শৃঙ্গ। যেন প্রমাণ করে দিচ্ছে - যে শিখরে পৌঁছেছে, তার সাফল্যকে কোনও অন্তরায়ই আড়াল করতে পারে না।

পৌঁছলাম জাজ পাস-এর মাথায়। তখনও আকাশে পুরোই মেঘের আচ্ছাদন। তবুও তার ফাঁক দিয়েই দেখা যাচ্ছে গঙ্গাবল আর নন্দকুল - যমজ লেক। মেঘ আর কুয়াশাও সেই অপরূপ নিসর্গকে আড়াল করতে পারেনি, এমনই তার রূপের ছটা! অভিষেকরা মেঘ কাটার অপেক্ষায় বসে থাকলো ক্যামেরা নিয়ে, বাকিরা নামা শুরু করলাম। পাহাড়ে চড়াই অতিক্রম করার পর উৎরাই দেখলে মনটা বেশ ফুরফুরে হয়ে যায়। যদিও উৎরাইতেও কষ্ট আছে যথেষ্ট। অনেকটা নামার পর সমতলে এসে পড়লাম। এখান থেকে গঙ্গাবল আর দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে নন্দকুল লেক আর তার সামনে হরমুখ শৃঙ্গ (কাশ্মীর উপত্যকার উচ্চতম শৃঙ্গ এটি)- এরাই আমাদের পথপ্রদর্শক।

নন্দকুল লেকের ধারে আমাদের টেন্ট তখন রেডি। আর এখানে এক রাত্রি নয়, দুটো রাত কাটাব। হাতে অঢেল সময়। এখানেও দেখলাম মৎস্যশিকারীদের

জাজ পাস থেকে দেখা যমজ লেক - গঙ্গাবল ও নন্দকুল

ভিড়। সারা বিকেল ছবি তুলে, আড্ডা দিয়ে আর স্বর্গীয় রূপসুধা পান করে কেটে গেল। তবে শ্রীনগরের পরিস্থিতি নিয়ে দুশ্চিন্তাটা ক্রমাগত খচখচ করেই চলেছে।

১৪ই জুলাই, ২০১৬: অখন্ড অবসর

আজ আমাদের সেই বহু কাঙ্ক্ষিত রেস্ট ডে। গত রাত্রেই কিচেন স্টাফদের বলে রাখা হয়েছিল আজ "নো বেড-টী", আর ব্রেকফাস্ট দশটার আগে নয়। দেরিতে ঘুম থেকে ওঠা, জমিয়ে আলুর পরোটা খাওয়া, ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো, আজ পুরোপুরি ছুটির মেজাজ। একটু পরে রওনা হলাম গঙ্গাবল-এর দিকে। এক প্রবল খরস্রোতা নদী পেরোতে হবে কয়েকটা পাথরের ভরসায়। সেই পাথর যেমন পিচ্ছিল, তেমনি ব্যবধান তাদের মধ্যে। একবার পা পিছলে পড়লে সোজা স্বর্গলাভ! এটাও অতিক্রম করে চলে এলাম লেকের ধারে। গঙ্গাবল ২.৫ কিমি. লম্বা আর চওড়ায় প্রায় ১ কিমি. বিস্তীর্ণ। আমরা ছাড়া আর বিশেষ লোকজন না থাকায় বেশ নির্বিঘ্নে, নিরিবিলিতে উপভোগ করা গেল বেশ কিছুটা সময়।

ফিরে এসে লাঞ্চ সেরে গল্প-গুজবে কেটে গেল সময়টা। আর তো মাত্র কয়েকটা ঘন্টা। কালকেই তো আলবিদা জানানোর পালা এই পাহাড়কে, এই প্রকৃতিকে। এই নদী, মাঠ-ঘাট, ভেড়ার পাল; এই টেন্ট, স্লিপিং ব্যাগ; এই বিলাসবর্জিত দিন, এই চূড়ান্ত সাদামাটা অথচ ভীষনভাবে দামী জীবনযাপন - সব কিছুকে কাল বিদায় জানাতে হবে। প্রাণপনে তাই শুষে নিতে চাইছি ভালোলাগা আর মুগ্ধতার শেষ বিন্দুটুকু।

১৫ই জুলাই, ২০১৬: শেষের সে দিন

অবশেষে আজ অন্তিম দিনের যাত্রার জন্যে তৈরি আমরা। সকালে স্লিপিং ব্যাগ তো রোজই গোছাতাম, আজ টেন্ট খোলার কাজেও হাত লাগলাম। গত সন্ধেতেই যদিও ট্রেক কমপ্লিশন সার্টিফিকেট পেয়ে গেছি, তাও আজকের দিনটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুহূর্তের অসতর্কতা ডেকে আনতে পারে চরম বিপদ। তার ওপর সকাল থেকেই আকাশ ভাঙা বৃষ্টি নেমেছে। ১৫ কিমি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে আজ। পুরোটাই নামা, নারানাগ আজ আমাদের গন্তব্য। ওখান থেকে শ্রীনগর যাওয়া হবে গাড়িতে, সম্ভব হলে আজই। কিন্তু মাথার ওপর কারফিউ-এর চিন্তা খাঁড়ার মত ঝুলছে। বৃষ্টিতে রাস্তার অবস্থাও তথৈবচ। ভয়ানক পিচ্ছিল কর্দমাক্ত রাস্তা এবং মুষলধারে বৃষ্টিকে সঙ্গী করে চলেছি। ক্রমাগত খাড়া উৎরাই-এর জন্যে হাঁটুর দু:সহ অবস্থা। নারানাগ পৌঁছে লাঞ্চ সেরে নেওয়া হল। তখনও শ্রীনগরের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের কেউ কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। উপরন্তু নিরাপত্তার কারণে সমস্ত মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ। বাড়িতে যোগাযোগ করার কোনও উপায় নেই এবং সেটাই সব থেকে বড় দুশ্চিন্তার বিষয়। না জানি সব খবর টিভিতে দেখে মা-বাবা কী চিন্তাই না করছে! অবশেষে ঠিক হল আমরা রাত ১.৩০ নাগাদ রওনা দেব এবং কাকডাকা ভোরে শ্রীনগর এয়ারপোর্ট পৌঁছে যাব যাতে কারফিউ এড়ানো যায়। দীর্ঘ এক সপ্তাহের নিরামিষ খাওয়ার যন্ত্রণা রাত্রে চিকেন খেয়ে মেটানো গেল কিছুটা।

১৬ই জুলাই, ২০১৬: ফেরার পালা

পরিকল্পনামত ভোর ৪.৩০ নাগাদ পৌঁছে গেলাম শ্রীনগর এয়ারপোর্ট। বাড়িতেও যোগাযোগ করে নেওয়া গেল একজনের পোস্ট-পেইড মোবাইল থেকে। ফ্লাইটের টাইম অনেকটা দেরিতে। এদিকে এয়ারপোর্টের ভেতরে নাকি ফ্লাইটের দু ঘন্টা আগে ছাড়া ঢোকা যাবে না। অগত্যা বাইরের ঘাসের লনেই বসে পড়া হল। ফ্লাইটও ক্রমাগত ডিলে হয়ে চলেছে। তাও এল এক সময়। ফিরে এলাম আবার দিল্লির বুকে।

নৈসর্গিক কৃষ্ণসর

~ *কাশ্মীর গ্রেট লেকস ট্রেক রুট ম্যাপ* ~ *কাশ্মীর গ্রেট লেকস ট্রেকের আরও ছবি* ~

পছন্দের বই আর গান হলে ব পৃথিবীকে আলাদা করে দিতে সময় লাগে না পর্ণা সাহানার। প্রিয় অবসর বিনোদন নানারকম রান্না আর হস্তশিল্প। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রালয়ে কর্মরতা। নিজের হাতে সংসার গোছানোয় বিশেষ যত্নশীল। মাঝে মাঝেই মুক্তির আনন্দে বেরিয়ে পড়া কারণ ছোট থেকেই পায়ের তলায় সর্ষে।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

নোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

উত্তর-পুবের জঙ্গল-পাহাড়ে

জাহির রায়হান

~ কাজিরাঙ্গার আরও ছবি ~ শিলং-চেরাপুঞ্জির আরও ছবি ~

১

লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ছ্যাঁচড়ামিটা করেই ফেললাম। স্বদেশদা ফোনে জানতে চাইল গৌহাটি আর শিলং-এ ভালো হোটেলের খবর দিতে পারব কিনা। তখন আমি অতি সুবোধ বালকের ন্যায় মায়ের জ্বালানি কাঠের বন্দোবস্তে ব্যস্ত ছিলাম। কাজকাম বিশেষ নেই, মনটাও পালাই পালাই করছে বহুদিন। তাই উত্তরে বললাম, দিতে পারি তবে কেন দেব? মানে? - স্বদেশদা সন্দিগ্ধ। মানে সিম্পল, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব। পরের পাঁচ সাত মিনিট বহুভাবে, যেমন, আমাদের প্রোগ্রাম সেটল্, ট্রেনের টিকিট হয়ে গেছে, গাড়িও বুক করে ফেলেছি ইত্যাদি ইত্যাদি বলে আমাকে নিরস্ত করার নিরন্তর চেষ্টা চলল। কিন্তু নাছোড় রবাহূত বা অনাহূত অতিথির মতো আমাকে থামানো গেল না। অতএব গুয়াহাটি, কাজিরাঙ্গা ও মেঘালয়।

সপরিবার স্বদেশদা, রেবাদি এবং বিবাহ-অযোগ্য আমি। রামপুরহাট থেকে ট্রেন ধরার ব্যবস্থা, কেন তা আমি আজও বুঝিনি। সাদা অ্যাম্বাসাডার চেপে রামপুরহাট। পথে সর্বসম্মতিক্রমে ব্যাঙ্ক চাকুরে স্বদেশদাকে ট্যুর ম্যানেজারের দায়িত্ব গছিয়ে নিশ্চিন্ত। টি-শার্ট, জিনস্ আর পায়ে হাওয়াই জুতো দেখে টিনা হাসতে লাগল, বলল - জাহির মামা, তুমি বেড়াতে চললে না কাজে চললে? বললাম, কানার আবার দিন রাত!! ভারতীয় রেল কবে যে ঠিকঠাক সময়ে চলেছে তা একমাত্র রেলের টাইম কিপারই বলতে পারবে। কিন্তু বিকেল সাড়ে পাঁচটার ট্রেন রাত সাড়ে দশটাতেও যখন এলো না, আমি কস্তুরাদিকে জিজ্ঞেস করলাম, দিদি ট্রেন ত্রিবান্দ্রম ছেড়েছে তো? দিদি বলল, তোমার দাদাকে জানো, টিকিট ওই করেছে। টিনার দিকে তাকিয়ে দেখি, তাকে প্রায় নিরঞ্জিত প্রতিমার মতো দেখাচ্ছে।

অনেক ছোটবেলায় আনন্দবাজারের ক্রীড়া সাংবাদিকের একটি লেখা পড়েছিলাম - অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট বিশ্বকাপ কভার করতে গিয়ে তিনি 'বিশ্বকাপের কড়চা'য় লিখেছিলেন, নিউজিল্যান্ডের ট্রেনে উঠেই আপনার মনে হবে আমরা এত গরিব কেন? ভারতীয় রেলের স্লিপারে উঠলেই আমার মনে হয়, আমরা এত অসভ্য কেন?! বেশি কথা বলে লাভ নেই, নিজের ধৈর্য ও সহ্য ক্ষমতা যদি বাড়াতে চান তাহলে স্লিপারে ভ্রমণ করুন। কোনওক্রমে রাতটুকু কাটিয়ে তাই দাদার কাছে চলে গেলাম। হাসি, মস্করা ও ঠাট্টার আবহে তখন বেড়ানোর আমেজ আসতে চলেছে। রসভঙ্গ হলো টিটি আসাতেই, আমার স্লিপারের টিকিট, রয়েছি থার্ড এসি'তে। স্বদেশদা কী যে বলল কি জানি, টিটি সাহেব মাথা নাড়াতে নাড়াতে চলে গেলেন। দাদা একটুখানি ভাব নেওয়ার আগেই, কস্তুরাদির টিপ্পনী, এরকম ম্যানেজারি সংসারেও তো একটু আধটু করলে পারো!!

২

গৌহাটি ঢোকার আগে থেকেই মোবাইল অকেজো। খোঁজখবর করে জানা গেল উত্তর-পূর্বে প্রিপেড সিম অচল। অবশ্য গাড়ি দাঁড়িয়েই ছিল। প্রথমে যাব কাজিরাঙ্গা। অনেকটা রাস্তা। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে যাত্রা হল শুরু। নানা জায়গায় ঘোরার সুবাদে বুঝেছি, যে কোনও স্থানে যাওয়ার আগে কিছু পড়াশোনা করা জরুরি, তাতে করে নতুন অভিজ্ঞতা আত্মস্থ করতে সুবিধে হয়। এবার যেটা একেবারেই হয়নি, তাই তাৎক্ষণিক বোঝাপড়ার ওপরই মনোযোগী হলাম। অবশ্য কস্তুরাদি ভূগোলের দিদিমণি, কিছু ব্যাখা অনায়াসে পাওয়া যাবে। সৌর ও টিনাকে দেখলাম তাদের বাবার সঙ্গে হিন্দি সিনেমায় হাস্যরসের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করছে, তার কেন্দ্রে রয়েছে রোহিত শেঠি পরিচালিত 'গোলমাল'। রেবাদি বলল - জাহির চুপ কেন? আমি আসলে স্বদেশদা ও কস্তুরাদির হনিমুন ট্রিপের কথা ভাবছিলাম, তখন তো ছেলে-মেয়ে ছিল না, কেমন ছিল তাদের সেই মধুযাপন। সে কথা বলতেই রসের দিক ভিন্ন হয়ে গেল। স্বদেশদা বলতে চাইল, সে আর বোলো না ভাই.....কস্তুরা শিকদারের যথারীতি ধমক - তুমি থামো তো!!

গৌহাটি টু গৌহাটি গাড়ি করে নেওয়ার সিদ্ধান্তটি দুর্দান্ত। ঝামেলা এবং সময় দুটোই বাঁচবে দারুণ ভাবে। রাস্তা মসৃণ এবং আরও চওড়া ও মসৃণ করার কাজও চলছে। ছবির মতো নগাঁও পেরোলাম, খুব ভালো লাগলো। নেমে পড়ার ইচ্ছেও জাগল। প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে, এখানকার বাড়ির ছাদ অধিকাংশই করগেটের চাল, ঢাল বজায় রাখার জন্যই এব্যবস্থা। আর একটা ব্যাপারও নজরে আসছে। আমাদের এলাকার মুন্না, আ-কার উচ্চারণ করতে পারে না। রাখালকে বলে রেখাল, আমিরকে বলে এমির, এরকম আর কী। তাকে নিয়ে হাসাহাসিও করি খুব। এখানে দেখছি এক্সিস বেঙ্ক, ষ্টেট বেঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। বুঝলাম পরিবেশের প্রকারভেদে ঠিক-ভুল বলে কিছু হয়না আসলে।

সন্ধ্যা এবং জঙ্গল একসঙ্গে শুরু হল। চালক সাবধান করলেন, বন্যপ্রাণী চোখে পড়লে চেঁচাবেন না একদম। চেঁচাতে হল না, আমাদের অভ্যর্থনায় কোনও বনবাসী একবারও এল না। তবে অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছুটে চলাটাও দারুণ উপভোগ্য। মেন রাস্তার পাশে আমাদের ঠিকানাটিকে হোটেল না বলে আস্তানা বলা যায় দিব্যি। বাঁশের খুপরিকাটা দেওয়াল, খড় বা ঘাসের ছাউনি। বিছানাটাও মানানসই এবং পরিবেশটাও মনোরম। বাবুদের কেমন লাগবে জানি না, তবে আমার মতো ছাপোষার কোন সমস্যা নেই। পরের দিন সকালে হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে গণ্ডার দেখার হাতছানি। সেই মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার! এই রে, স্বপ্নে আবার হানা দেবে কিনা কে জানে!!

বেশ কিছুটা পথ জিপ গাড়ি করে, তারপর হাতির পিঠে। রেবাদিকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে হাতি ও গণ্ডারের নানান সম্ভব অসম্ভব গল্প শোনালাম। হাতি লম্বা লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে চলতে থাকল। অনেকগুলো একশৃঙ্গ গণ্ডারের দেখাও মিলল। মনে হয় যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। মারাত্মক রকমের রোমাঞ্চ যে হল তা নয়, বরং পুরো ব্যাপারটাই কেমন সাজানো গোছানো বলেই মনে হল। একরকম নির্ভয়েই বন্যতাহীন বন্যপ্রাণী দর্শন। কাজিরাঙ্গা থেকে শিলং। আবার চেনা দৃশ্যে ফেরা। গাছ, লতাপাতা ও নির্জনতা নিয়ে পথচলা। ইন্ডিয়ান অয়েল, এইচ পি, ভারত

পেট্রলিয়ামের পেট্রলপাম্প দেখা অভ্যস্ত চোখে দেখলাম নুমলিগড় পেট্রলপাম্প আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, ইস্ আমি বাড়ির বাইরে।

৩

শিলং পৌঁছতে রাত্রি হয়ে গেল এবং বেঁধে গেল দক্ষযজ্ঞ, হোটেল নিয়ে। অতি জঘন্য হোটেল। খাটে পায়ার বদলে ইটের ঠেকা, বাথরুম কমন এবং সেটা অন্তত তিন কিমি দূরে, এ মাপজোকটা কস্তুরাদি করেছিল, ঠিক কোন পদ্ধতিতে তা অবশ্য আমি জানি না। আমার অবস্থা তখন জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। একদিকে কস্তুরা-স্বদেশের ফাইটিং অন্যদিকে হোটেলের মাতালদের হাত হতে পরিত্রাণের চিন্তা। ভোররাত্রে কাউকে কিছু না বলেই বেরোলাম অমৃতলোকের সন্ধানে। ফিরলাম যখন, তখনও কেউ ওঠেনি। ভালোই হল, প্রত্যেককে ওই অবস্থায় সহজে নিয়ে আসা গেল নতুন হোটেলে। সেখানেই সকালের প্রথম টয়লেট এবং নিশ্চিন্তের চা।

দাদা-দিদি'র মিউচুয়াল আন্ডারষ্ট্যান্ডিং হয় গেছে অনেকক্ষণ। ভাগ্নে ভাগ্নিও স্বাভাবিক। এবার শিলং পিক যাওয়া যেতেই পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৯৬৫ মিটার উঁচু এই পিক থেকে সারা শিলং একলহমায় দেখা যায়, অদ্ভুত সে অভিজ্ঞতা। সেনাবাহিনীর একটি সদাজাগ্রত বেস ষ্টেশনও আছে ওখানে। অনুরোধ উপরোধ করে সেটাও নিলাম দেখে। যাওয়া হলো গলফ কোর্স। পাশেই একটি সুন্দর বাড়ি, হরেক রকম ফুল দিয়ে সজ্জিত। বাড়িটি মনে গেঁথে গেল। তারপর লেডি হাইদারি পার্ক, তারপর ওয়ার্ডস্ লেক এবং সবশেষে বাটারফ্লাই গার্ডেন দেখে ডেরায়। সন্ধেটা বাজার এলাকায় ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি, টুকিটাকি কেনাকাটা। শুনেছি মেঘালয় ও মিজোরামে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। সেই জীবনপ্রবাহটা দেখার আগ্রহও রয়েছে। দ্বিতীয় দিন এলিফ্যান্ট ফলস্, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের পক্ষে যুদ্ধ করা খাসি সৈনিকদের স্মৃতিতে তৈরী মৎফার্ণ। চেরাপুঞ্জির সাত বোনের জলছবি বা সেভেন সিস্টারস্ ফলস্ পেরিয়ে একটা স্থান থেকে বাংলাদেশের সিলেট দেখা যায়। বাঙালির মন বাংলাদেশের জন্য সততই আকুলি বিকুলি করে। আমিও বাদ নই, বাংলা ভাষায় একটা পুরো দেশ চলছে এটাই তো মাঝেসাঝে আমার বিশ্বাস হতেই চায় না। একচটক মনে হল একবার পায়ে হেঁটে এখান থেকে বাংলাদেশ চলে গেলেও বেশ হয়।

কিছু নাম শুনলেই দেখবেন মনটা কেমন কেমন করে, কেমন জানি উদাস হয়ে যায়। 'মৌসিনরাম' এমনই একটি শব্দ। পথ হারানোর সেরা দিন আজ। যাচ্ছি মৌসিনরাম, পৃথিবীর সবচেয়ে বর্ষণমুখর স্থান, যাকে আমরা চিনি সেই ক্লাস সিক্স থেকে। নির্জন, সবুজ, গিরিখাত আর হারিয়ে যাওয়ার হাতছানি। প্রকৃতির উদারতার কাছে আমরা যে কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ তা এমন দিনেই মালুম হয়। ঢেউ খেলানো পাহাড়শ্রেণী, দিগন্তবিস্তৃত সবুজ, অবারিত আকাশনীল যেন তার কোল পেতে আমাদেরই আবাহন করতে চায়, সেখানে মাঝেসাঝেই থামছি, নামছি, দেখছি। দেখছি কোনও মেঘালয়ী মা তার সন্তানকে সামলে ক্ষেতকাজে ব্যস্ত। কেউ বা একপাল ভেড়া নিয়ে চলেছে, চোখে চোখ পরলেই মুখময় সরলহাসি। বারণ করেনি কেউ, তবু সকলেই চুপ। পাখি কি কোন কথা বলে? মেঘের আলয়ে এসে আমরাও বুঝি পাখি হয়ে গেছি।

মৌসিনরাম মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টি বুঝি নামল ঝেঁপে। কুয়াশার মতোই আঁধার। গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, স্থানীয় একজন বললেন মিনিট দশেক সময় দিন, সব পরিস্কার হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হলও সেই ম্যাজিক। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝকঝকে নীলাকাশ। পুরো পাহাড়শ্রেণীই চোখের সামনে যেখানে ধাক্কা খেয়ে মৌসুমী বায়ু অঝোর ঝারায় সমতলে পড়ে ঝরে। কখনও ভাবিনি একই যাত্রায় কৈশোরের দুটি প্রেম কাজিরাঙ্গা আর মৌসিনরাম দর্শন হবে। স্বদেশদাকে ধন্যবাদ। রামকৃষ্ণ মিশন দেখে আজই গৌহাটি ফিরব। প্রথম রামকৃষ্ণ মিশন আবার আমার বাড়ির পাশে সারগাছিতে অবস্থিত। এ প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হলে আমি জোরের সঙ্গেই বললাম, একমাত্র ব্যক্তিত্ব বিবেকানন্দ, যাঁর চিন্তাভাবনায় একটি সম্পূর্ণ দেশ গড়ে উঠতে পারে, এখনও। উপস্থিত সবাই একবাক্যে মেনে নিল সে কথা।

ব্রহ্মপুত্রের বিশালতা দেখে রাজমহলের গঙ্গার কথা মনে পড়ে। কী বিশাল, কী বিরাট! নৌকা চেপে নদীদ্বীপে অবস্থিত উমানন্দ মন্দিরটি দর্শনে গিয়ে সত্যি কথা বলতে কী ওই বিশালতায় একটু ভয় ভয়ও করছিল। তবে সরাইঘাট ব্রিজ পেরিয়ে দোলগোবিন্দ মন্দির ঘুরে আসা যায় দিব্যি। শ্রীমন্ত্র শংকরদেব কলাক্ষেত্র চত্বরে হঠাৎই বিহুসহ অন্যান্য আদিবাসী নৃত্য দেখার সুযোগ হয়ে গেল। সম্ভবত বিহু উৎসবের প্রস্তুতির অঙ্গ। গৌহাটির ব্যবসা ক্ষেত্রে বাঙালিদের দারুণ রমরমা। বিহু, মেখলার আসাম, চা-বাগানের আসাম অশান্ত হওয়ার খবরে তাই বিচলিত হই। কামাখ্যা মন্দিরে সকলে পুজো দিতে গেল, আমি বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে গাড়িতে বসে রইলাম। মনে মনে একটা হিন্দুনাম ভেবে নিয়ে মাতৃদর্শনে বেরোলাম একা-একাই। আসলে নিজের কারণে বাকিদের কোন বিশ্রী পরিস্থিতিতে ফেলতে চাইনি। দর্শন শেষে মন্দিরের পিছনে পাহাড়ের ওপর থেকে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে আরও একবার দেখা হল। নীচে নেমে জানালাম মাতৃদর্শনের কথা, রেবাদি বলল - বেশ করেছ, সন্তানের আবার হিন্দু মুসলিম কি?!

~ *কাজিরাঙ্গার আরও ছবি* ~ *শিলং-চেরাপুঞ্জির আরও ছবি* ~

জাহির রায়হান কলেজে পড়ান এবং সর্বদা উল্টোপথের পথিক I যে কাজে লোকের অনীহা সেই কাজেই তাঁর তুমুল উৎসাহ I খাওয়াদাওয়া, বেড়ানো আর আমোদপ্রমোদেই জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করা যায় বলে বিশ্বাস করেন আর এই বিশ্বাস নিয়েই দিব্যি বেঁচে আছেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select - ▼

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

under

স্মোকি পাহাড়ের অরণ্যে

কালিপদ মজুমদার

~ *গ্রেট স্মোকি মাউন্টেনের আরও ছবি* ~

"গ্রেট স্মোকি মাউন্টেনস" - সুন্দরের সেই দেশ রয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ক্যারোলিনা রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম কোণে।

এপ্রিল মাসের এক ভোরে দক্ষিণ ক্যারোলিনা রাজ্যের সমুদ্র শহর চার্লস্টন থেকে রওনা দিয়ে আই-২৬ এবং আই-৪১ রাজপথ ও শেষে ইউ.এস.-১৯ পথ বেয়ে স্মোকি মাউন্টেনের প্রবেশদ্বার চেরোকী শহরে যখন এসে পৌঁছালাম তখন বেলা গড়িয়ে দুপুর। শহরের এক কোণে হোটেল "চেস্টনাট ট্রি"- তে জিনিসপত্র রেখে চারদিক কিছুটা ঘুরে দেখব বলে বেরিয়ে পড়লাম।

চেরোকী থেকে কিছু দূরে উত্তর ক্যারোলিনা রাজ্যের শেষ সীমানায় আছে "ক্লিংম্যান্স ডোম" অঞ্চল। সেই পথ ধরে শহরের সীমা পার হতেই ধীরে ধীরে চড়াই শুরু হল। পাহাড়ের বুক চিরে দুই পাশের ঘন বনতল ধরে পথ চলেছে এগিয়ে। চলতে চলতে ডান হাতে দেখা দিল পাহাড়ি নদী - পিজিয়ান রিভার। দুরন্ত গতিতে নেমে আসছে সে কোন দূর পাহাড়ের অজানা শিখর থেকে। শত উপল খণ্ডে বাধা পেয়ে পেয়ে কী আনন্দ তার! ফেনার পাপড়ি তুলে নিশিদিন নেচে নেচে চলেছে গান গেয়ে গেয়ে।

কখনও ওপরে, কখনো নীচে, পাকে পাকে সুন্দরের ছবি আঁকা পথ বেয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে মন ভোলানো ঘন সবুজ তৃণভূমি দেখা দিয়ে আবার আড়ালে হারিয়ে যায়। সেখানে দু-এক জায়গায় দেখা হল হরিণ আর নীল গাই পরিবারের সঙ্গে। নির্ভয়ে চড়ে বেড়াচ্ছে তারা। গাছের চাঁদোয়ার ফাঁকে ফাঁকে আকাশের নীলিমা। শীতল বাতাস আর গভীর নির্জনতার বুকে পাখিরা নির্ভয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে এদিকে ওদিকে। কোথাও বনফুলের শোভা আলো করে আছে বনভূমি। পথের কিনারে দু-এক জায়গায় দেখলাম ছোটো বরফের স্তুপ, এখনও শীত ঘুম ভাঙেনি ওদের।

দেখতে দেখতে এক সময় উত্তর ক্যারোলিনা রাজ্যের সীমা পার হয়ে প্রবেশ করলাম টেনেসী রাজ্যের সীমানার মধ্যে। বড় রাস্তা ছেড়ে আর একটা পাহাড়ি পথ ধরে হেঁটে অনেকটা ওপরে উঠে এলাম "ক্লিংম্যান্স ডোম"-টাওয়ারে। সমুদ্রতল থেকে এই টাওয়ারের উচ্চতা - ৬,৬৪৩ ফুট, এটাই টেনেসী রাজ্যের উচ্চতম স্থান।

উঁচু টাওয়ারের মাথায় উঠে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। যত দূরে চোখ যায়, ধরণীর মুক্ত অঙ্গন - মাঝে দিগন্ত জুড়ে অনন্ত অচল পর্বতমালার সারি। সেখানে নেই কোনও জনমানবের চিহ্ন, নেই কোনও ঘরবাড়ি। মনোহর সেই অচল রেখার ওপারে, আরও অনেক দূরে দেখা যায় আবছা নীল পাহাড়ের সারি ভুবন জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে আকাশ সীমা ঘিরে। ক্ষীণ একটা নীলাভ কুহেলিকার আবরণ ছেয়ে আছে তাদের শিখরে শিখরে, কন্দরে কন্দরে। কি জানি এই জন্যই এই "স্মোকি" নাম কিনা! চরাচর জুড়ে অনন্ত প্রশান্তি আর এক স্বর্গীয় পরশ যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে সব। অবসন্ন আলোয় নীল পাহাড়ের দেশের সেই অনিন্দ্য সুন্দর রূপ দেখে মন আচ্ছন্ন হল এক গভীর আবেশে।

ক্লিংম্যান্স ডোম থেকে দূরের অ্যাপেলেসিয়ান পর্বতমালা

সামনে উত্তর-পশ্চিম কোণে, অনেক দূরে টেনেসী রাজ্যের আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে আবছা অ্যাপেলেসিয়ান পর্বতমালা। তারা যেন অন্য এক ধরণী থেকে আমাদের দিকে চেয়ে আছে অবাক বিস্ময়ে। সেই দেশ বুঝি আমাদের এই ভুবনপারের অন্য কোনও এক ভুবন। তার এই পাড়ে, দক্ষিণে, অনেকটা নীচে দাঁড়িয়ে সুদূর প্রসারিত নান্তাহালা অরণ্যমালা। দূরের সেই অরণ্যের উপর সূর্যের তির্যক আলো আর পাহাড়ের নীলিমা মিলে আকাশ তলে রচনা করেছে এক অনুপম সুন্দর দৃশ্য। মনে হল সে বুঝি কোনও রূপকথার দেশ!

সামনে, অনেকটা নীচে আবছা দেখা যাচ্ছে সুদীর্ঘ ফন্টানা লেকের জলরাশির কিছুটা অংশ। সেখান থেকে আলোর বিচ্ছুরণ চোখে এসে পড়ছে। হু হু করে হিমেল বাতাস ছুটে আসছে চারদিক থেকে। মুহূর্তে শরীরের সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। মন এখান থেকে যেতে চায় না, তবুও

এক সময় নীচে নেমে আসতে হল।

পথে অরণ্য আর পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আবার ফিরে এলাম চেরোকী শহরে। সুর্য তখন পশ্চিমের পাহাড়ের মাথার ওপরে। এখানে সন্ধ্যা হয় কিছুটা দেরীতে। উঁচু পাহাড়ের তলায় খুবই ছোটো শহর এই চেরোকী, তবে বেশ সাজানো গোছানো আর পরিচ্ছন্ন। শহরের একেবারে পশ্চিম সীমানা দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট পাহাড়ি নদী "অকুনালুফতী"। অকুনালুফতীর জল বড় চঞ্চল আর ভারি শীতল। কাচ রঙ সেই স্বচ্ছ জলে কত মাছের ঝাঁক খেলে বেড়ায় মনের আনন্দে। বুনো হাঁসের দল কোথাও নির্ভয়ে জলে ভাসছে, আবার কোথাও মনের সুখে রোদ পোহাচ্ছে নদীর কিনারে, বালুর চরে। নিশিদিন অকুনালুফতীর স্বচ্ছ জলের স্রোতে কেঁপে কেঁপে চলে পাহাড় আর অরণ্যের নিবিড় ছায়া। নীল আকাশের সুনীল ছায়া নীরবে হাতছানি দেয় সেই জলতলে।

চেরোকী শহরের পাশে পাশে বয়ে চলা অকুনালুফতী নদী

বহু দূর থেকে আসা পথ শহরের বুক চিরে চলেছে স্মোকি পর্বতমালার গভীর দেশ পার হয়ে আরও দূরে। সেই সড়ক আর নদীর কিনারে কত সুন্দর সুন্দর দোকানপাট, হোটেল, রেস্তোঁরা আর ঘরবাড়ি। সব যেন বিরাট পাহাড়ের গায়ে পটে আঁকা ছবি।

শহরের মাঝখানে, হসপিটাল রোডের পুব কিনারে আছে চেরোকী ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম। এখানকার আদি বাসিন্দা চেরোকী রেড ইন্ডিয়ান জাতির ব্যবহার্য নানা প্রাচীন জিনিস - বিচিত্র রঙের মুখোশ, মালা, চুড়ি, পালকের টুপি, গয়না, পোশাক, বাসনপত্র আরও কত কী সুন্দরভাবে সাজানো আছে সেখানে। মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে পথে আসতেই সহসা সামনে দেখি এক চেরোকী ইন্ডিয়ান রমণী তাদের পুরনোদিনের সাজপোশাক পরে দাঁড়িয়ে। গলায় নানা রঙের পুঁতি আর পাথরের মালা। মাথায় পালক গোঁজা বিচিত্র টুপি, দুই গালে উল্কি, মুখে তার মৃদু হাসি! আচমকা সামনে এমন প্রাচীন দিনের মূর্ত জীবন ছবি দেখে আমরা বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখতে দেখতে পথ চলতি আরও কিছু মানুষজন দাঁড়িয়ে পড়ল তাকে দেখার জন্য। ফটো তোলার হিড়িক পড়ে গেল। একটু ভীড় হতেই সেই রমণী সহসা কোথায় যেন গেল হারিয়ে।

চেরোকী ইন্ডিয়ানরা এদেশের প্রাচীন উপজাতিদের মধ্যে অন্যতম। অতীত দিনে বহু ঝড়ঝাপটা এবং দুঃখকষ্ট সহ্য করে উত্তর ক্যারোলিনার এই অঞ্চলের চেরোকীরা আরও অন্য চেরোকীদের সঙ্গে মিলে দেশান্তরী হওয়ার দুর্যোগ থেকে নিজেদের রক্ষা করেছে এবং "ইস্টার্ন ব্যান্ড অফ চেরোকী ইন্ডিয়ান্স"-এর স্থাপনা করেছে। আজ তারা বেশ প্রতিষ্ঠিত।

সেখান থেকে ড্রামা রোড ধরে, নদী পার হয়ে, শহরের পশ্চিম কিনারে চলে এলাম অকুনালুফতি রোড ধরে। এই অঞ্চলটা বেশ নির্জন। পথ চলেছে পাহাড়ের তলা দিয়ে নদীর একেবারে পশ্চিম কিনারা ঘেঁসে। নদীর কিনারে ছোট একটা সুন্দর পার্কে এসে বসলাম। নাম তার "অকুনালুফতি আইল্যান্ডস পার্ক"। নদীর মরা বাঁকে কী সুন্দর একটা মুলি বাঁশের ঝাড়। ছোট ছোট গাছ আর সবুজ ঘাসে সাজানো পার্কে বাচ্চারা খেলা করছে আনন্দে। তাদের কলরবে পার্কটা মুখর হয়ে উঠেছে। লোভ সামলাতে না পেরে নদীর জলে নামলাম এসে। মিষ্টি জলে পা ডুবিয়ে শরীর শীতল হল, আর সে জল চোখে মুখে দিয়ে মুহূর্তে সব ক্লান্তি দূর হল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। একসময় পাহাড়ের ওপারে সূর্য পাটে গেল। সাঁঝের আবছা আঁধারে ফিরে এলাম হোটেলের আস্তানায়।

নির্জনে পিজিয়নের ধারা

পরদিন খুব ভোরে বেরিয়ে পড়লাম পাহাড়ি পথে। লক্ষ্য এখান থেকে একষট্টি মাইল দূরের "কেডিস কোভ" নামক উপত্যকা। সকালের ঘন বনতলে ঠান্ডার একটা মিষ্টি আবেশ। পাখিরা তাদের প্রভাত বন্দনায় বনতল মুখর করে তুলেছে। পথের কিনারে, ডান দিকে আবার দেখা দিল সুন্দরী "পিজিয়ন রিভার"। তারই সঙ্গে কখনও দেখা দিচ্ছে দুরন্ত সব নালা আর তাদের কত শাখা-প্রশাখা। মাঝে মাঝে খাড়া পাহাড়ের বুকের তলা দিয়ে যেতে যেতে ভয়ে শিহরণ লাগছে মনে, যেখানে বিকট পাথর খণ্ড ঝুলছে মাথার ওপর। চলার পথে এক জায়গায় দেখলাম নীলগাইরা চরে বেড়াচ্ছে সবুজ তৃণভূমির বুকে। হরিণের দলের সঙ্গেও দেখা হল দু-এক জায়গায়। এমনি করে নিরন্তর চড়াই আর উতরাই পেরিয়ে চলেছি গম্ভীর পাহাড় আর তার চোখ ভোলানো সুন্দরের বুক চিরে।

এক সময় পথ ঢালু হয়ে নেমে এল সমতলে। পথের কিনারে দেখা দিল ঘন সবুজ তৃণভূমি। আসার পথে এক জায়গায়, খেতের ধারে দেখলাম কয়েকটা টার্কি চরে বেড়াচ্ছে। চলতে চলতে সহসা চারদিক ফাঁকা একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝে এসে পড়লাম। সেখানে মেঠো পথ ধরে সামনের পাহাড়ের দিকে হাঁটতে হাঁটতে পুরোনো দিনের একটা বাড়ি দেখতে পেলাম। বাড়িটা এই স্মোকি অঞ্চলের ব্রিটিশদের প্রথম বসতির চিহ্ন, যা আজও সেই প্রাচীন দিনের স্মৃতি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। পথ থেকে ভূমি ক্রমে ওপরে উঠছে পাহাড়ের দিকে। বাড়িটা পাহাড়ের নীচে একলা দাঁড়িয়ে। পাথরের দেওয়াল আর শ্লেট পাথরের চালার পুরোনো সে বাড়ি। মোটা হাতে চাঁচাছোলা করা বড় বড় গাছের গুঁড়ি চিরে দুভাগ করে তাই দিয়ে গড়ে তোলা ঘর। সামনে একচালার খোলা বারান্দা। ভিতরে এক কোণে পাথর ঘেরা আগুন জ্বালাবার ফায়ার প্লেস। তার গা দিয়ে ওপরে যাওয়ার সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি। মাথা নীচু করে উঠতে হয় সেই সিঁড়ি দিয়ে।

এখান থেকে সামনে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর ক্রমে ঢালু হয়ে নেমে চলেছে ধীরে ধীরে। তার ওপারে, দিগবলয় ঘিরে ঘন অরণ্য রেখা। এককালে এসব ছিল ভরা শস্য খেত। এখন দেশের সরকার সেসব অধিগ্রহণ করে মিলিয়ে দিয়েছে অরণ্য ভূমিতে। আরও কিছু ভ্রমণার্থীও এসেছে এই বাড়ি দেখতে। শিশুদের কলরবে সেই বাড়ি আর পাহাড় নির্জনতা ভেঙে জেগে উঠল।

স্মোকিতে ইংরেজের প্রথম বসতি

ফেরার পথে দেখা হল মিস্টার ম্যাকের সঙ্গে। কাঁধে তার ছোট্ট ছেলেটি বাবার মাথার চুল মুঠো করে ধরে বসে আছে পা দুটি ঝুলিয়ে। আর, বড়োটি বাবার হাত ধরে চলেছে হেঁটে। সুদূর এই দেশেও আমাদের সেই চিরন্তন প্রাচীন গ্রাম্য জীবনধারার এমন চিত্র দেখতে পাব ভাবিনি! বড় ছেলেটির বয়স বছর পাঁচেক হবে, ছোটোর বোধহয় বছর দুই। জানলাম শিশুদুটির মা নেই। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। মাতৃহারা দুই শিশুকে নিয়েই দিন কাটে বাবার। আলাপ হল। কথায় কথায় ম্যাক জানালেন মাঝে মাঝেই শিশুদুটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি পথে। দেশ দেখার আনন্দ দিয়ে বুকের গভীরে সাথী হারানোর বেদনায় শান্তির প্রলেপ দিতে এমনি করে বার বার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া তাঁর। তাদের বিদায় জানিয়ে এগিয়ে চললাম দুদন্ডের সেই বিষাদ স্মৃতি নিয়ে।

দূর প্রান্তরের সীমানা ঘুরে পথ চলেছে এগিয়ে। চলতে চলতে অরণ্য কিনারে আবার দেখতে পেলাম ব্রিটিশদের সেই পুরোনো দিনের কিছু ঘরবাড়ি। ঘন বনের মধ্য দিয়ে ছোট ছোট নালা আর টিলা-পাহাড়ের বুক চিরে চড়াই উতরাই পার হয়ে চলেছি এগিয়ে। পথে মাইল সাতেকের একটা পাক মত ঘুরে এক সময় চলে এলাম "কেডিস কোভ"-এ। এটা স্মোকি মাউন্টেন অঞ্চলের সর্বনিম্ন স্থান। সেখানে হেঁটে হেঁটে বনতলে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। সুন্দর লম্বা লম্বা পাইন গাছের তলা দিয়ে হাঁটার সময় তাদের মিষ্টি দেহ সুবাস যেন অনুভব করছিলাম চারদিকে। ভিজিটরস সেন্টারে খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার চললাম এগিয়ে। এবার ফেরার পালা।

চলতে চলতে চোখ উদগ্রীব হয়ে আছে ভালুক দেখার জন্য। আসার সময়ও উদগ্রীব চোখে চারদিক খুঁজেছি তাদের আশায়। কালো ভালুকদের বাসভূমির জন্য বিখ্যাত এই অরণ্য-পাহাড় অঞ্চল। গভীর জঙ্গলের মধ্যে মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘন সবুজ তৃণভূমি। ভালুকেরা নাকি কখনও কখনও সেখানে দেখা দেয়। কিন্তু শত আগ্রহ নিয়েও তাদের দেখা পেলাম না। তাই খানিকটা অপূর্ণ মন নিয়েই ফিরে চললাম।

অনেক ওপরের পাহাড় থেকে নির্জন অরণ্যের বুক চিরে নেমে চলেছি। তন্ময় হয়েছিলাম চারদিকের সৌন্দর্যের মাঝে, তাই কতটা পথ পার হয়েছি খেয়াল নেই। সহসা পথের বাঁকে দেখি দু-চার জন কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে কী যেন দেখছে। কেউ কেউ আবার ফটো তোলায় ব্যস্ত। মূহূর্তে নেমে পড়লাম আমরাও।

পথের কিনারে, নীচে, নালার ধারে একটা মাঝারি আকারের কালো ভালুক আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে একা একা। কখনও সে নামছে নালায়, আবার কখনও উঠছে ওপরে। এ যেন কর্মহীন উদাসী বেলায় সময় কাটানোর খেলা। দেখতে দেখতে আরও মানুষজন জড়ো হল। তবে আশ্চর্য, কারও মুখে একটিও কথা নেই, নেই টুঁ শব্দটি। বাচ্চা বুড়ো সবাই নিঃশব্দ। আর, ভালুক ভায়ারও যেন নেই কোনো অসন্তোষের ভাব। আনমনে ঘুরে বেড়িয়েই চলেছে সে। ফটো তোলার ধুম পড়ে গেল।

প্রাণ ভরে দেখলাম সেই বন্য সুন্দরকে। আবার পথ চলা। পথের বাঁকে আবার যদি কোনও চমক অপেক্ষা করে থাকে তাই সজাগ চোখে চেয়ে আছি। মাঝে মাঝে হরিণ আর নীল গাইদের দেখা পেলাম দু-এক বার। পাহাড়ের পথ প্রায় শেষ হয়ে আসছে। এবার, একেবারে সামনে, পথের ডান হাতে দেখি দুটো পুঁচকে ভালুক ছানা খেলতে খেলতে লুটোপুটি খাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। কখনো দুজনে জড়াজড়ি করে পাহাড়ের ঢাল থেকে গড়িয়ে পড়ছে নীচে, আবার পরক্ষণেই দৌড়ে উঠছে ওপরে। সারা গায়ে তাদের ধুলো আর রাজ্যের শুকনো পাতার কুচি। ওদের কান্ড দেখে মনে হল একটু কোলে নিয়ে আদর করি। পরক্ষণেই ভাবলাম কী ভয়ঙ্কর ভাবনা। মা ভালুক যে আশেপাশেই আছে কোথাও সেটা নিশ্চিত।

পথের ধারে ভালুক শাবকেরা

অবাক চোখে বাচ্চাদুটোর দুষ্টুমি দেখছি। ক্রমে লোক বাড়ছে। সহসা নালার গভীর থেকে মা ভালুক বেরিয়ে এল। ঘোর কালো আর মস্ত তার চেহারা। তাকে দেখে খুব আনন্দ হল, আবার ভয়ও লাগল মনে। ছানারা মাকে দেখে দৌড়ে এসে একবারে মায়ের বুকের তলায় গিয়ে সে কী খেলা! মায়ের মুখে মুখ ঘষছে বারবার। মা তাদের একটু আদর করে আবার সরে যেতেই, নালার ওপরে পড়ে থাকা শুকনো, সরু লম্বা গাছটার ওপর দিয়ে এপার ওপার করার খেলায় মেতে উঠল ওরা। সে কী দুষ্টুমি তাদের। পড়ে যাওয়ার ভয়ও নেই একটুও, আর আমাদের এতগুলো লোকের দিকেও নেই কোনও ভ্রুক্ষেপ।

আমরা সবাই দেখেই চলেছি অবাক চোখে। স্তব্ধ, নিস্পন্দ বনভূমির বুকে মাঝে মাঝে দূরের কোনও অস্পষ্ট ধ্বনি ভেসে আসছে কখনও, কিংবা গাছের কোনও মরা ডাল খসে পড়ার শব্দ। তারই সঙ্গে, মাঝে মধ্যে দুষ্টুদুটোর কপট রাগের শব্দ। স্তব্ধ সব দর্শককুল। একটু পরে সহসা

ঝোপের আড়াল থেকে মৃদু গর্জন হতেই ছানা দুটো পড়ি মরি করে এক ছুটে মায়ের কাছে হাজির। বুঝলাম এরই মধ্যে মায়ের সোহাগ আর শাসনে সহবত আদি ঠিক মতই রপ্ত করতে পেরেছে। হোটেলের ঘরে ফিরতে ফিরতে অন্ধকার হয়ে গেল।

পরের দিন সকালে স্নানাদি সেরে সব জিনিসপত্র নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম হোটেল ছেড়ে। আজ ফেরার দিন। এখান থেকে মাইল দশেক দূরে কয়েকটা জলপ্রপাত আছে শুনেছি। সেই দিকটাও একটু দেখে যাব বলে ঠিক করলাম। শহর ছেড়ে নানা আঁকা বাঁকা পথে চলতে চলতে দেখা দিল ছোট ছোট কিছু পাহাড় আর টিলা। তাদের কোলে সুন্দর সুন্দর ছবির মত বাড়ি ঘর, ফুলের বাগান আর সবুজের বাহার দেখে মন ভরে গেল।

এক সময় বড় রাস্তা ছেড়ে টিলার পথ ধরে চললাম। চলার পথ ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হয়ে এল। তারপর এল নুড়ি আর কাঁকর বিছানো পথ। চলতে চলতে এক জায়গায় এসে সেই পথও শেষ হয়ে গেল। দেখলাম সামনে নালার ওপরে কাঠের সরু পোল। সেই পোল পার হয়ে হেঁটে চড়াই ধরে কিছুটা যেতেই শুনতে পেলাম সামনে জলের শব্দ। আরও খানিকটা এগিয়ে দেখলাম দূরের পাহাড় থেকে আসা একটা বড় নালার জলধারা আচমকা অনেকটা নীচে লাফিয়ে পড়ছে। নীচে পড়েই রাশি রাশি ফেনার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসে আবার ছুটছে আরও নীচের নূতন দেশে। সে জায়গা থেকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আবার একটা জলপ্রপাত দেখতে পেলাম। এমনি করে লরেল, আব্রাহাম আর রেইনবো - এই তিনটে জলপ্রপাত দেখলাম ঘুরে ঘুরে।

রেইনবো ফলস

চারদিকে পাহাড়ের পাক। তাদের আনাচে কানাচে আরও কিছু নালার দেখা পেলাম। ঘন বনতলের ছায়ায় ছায়ায় নানা দিক থেকে তাদের কলকণ্ঠের অনুরণন কানে ভেসে আসছে নিরন্তর। তারি সঙ্গে পাখিদের কাকলি আর অজানা ফুলের সুবাস মিলে নির্জন সেই বনপথকে করে তুলেছে মধুময়। পথে আমাদের মত আরও কিছু মানুষজনের দেখা পেলাম।

সেখান থেকে নেমে এসে একটা মাইল তিনেকের পাকদন্ডি পথ ধরে ঘুরে দেখব বলে চললাম নানা ছোট টিলা আর নালার পথ কেটে। একেবারে নির্জন পথটা। গা যেন ছম ছম করছে সে পথে চলতে গিয়ে। হঠাৎ ছোট একটা নালার কিনারে দেখতে পেলাম একটা সাপ চুপচাপ শুয়ে আছে। লম্বায় ফুট চার-পাঁচেক হবে। এমন জনহীন অরণ্যপথে তাকে দেখে ভয় লাগল বেশ। উজ্বল ঘন কালো তার রঙ। এ দেশে ওকে বলে "র‍্যাট স্নেক"। কিন্তু আমাদের দেখে নড়ল না সে একটুও মোটে। হয়তো অতি ভোজনে লাচার হয়ে পড়েছে বেচারী। অগত্যা কিছু দূর দিয়ে ঘুরে পাশ কাটিয়ে চলে এলাম।

এবার অন্য একটা পথ ধরে চলেছি ঘুরে। উদ্দেশ্য আরও নতুন কিছু দেখা। যেতে যেতে এক জায়গায় পথের সামনে দেখলাম রেল লাইনের ওপর কয়েক সারি রেল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সাইডিং-এ। তাদের গায়ে বড় বড় হরফে লেখা - "গ্রেট স্মোকি মাউন্টেন রেলওয়ে"। সেই সুদূরের পথিককে বিদায় জানিয়ে আবার চেরোকী শহরে ফিরে এলাম। সেখান দিয়েই ফেরার পথ আমাদের।

অকুনালুফতির কিনারে সুন্দর একটা রেস্টুরেন্টে বসলাম। নদীর জলে হাঁসের দলের জলকেলি দেখতে দেখতে প্যান কেক খেতে বেশ ভালই লাগল। ওটাকেই আমরা বলি গোলা রুটি। তবে নানা রকম ক্রীম আর সস দিয়ে সেটাকে মনলোভা করে পরিবেশন করার কায়দায় কেবল যে দেখতে সুন্দর হল সেটা তা নয়, খেতেও সুস্বাদু লাগল।

প্রায় আটশ বর্গ মাইলের এই "দি গ্রেট স্মোকি মাউন্টেনস ন্যাশানাল পার্ক" এর পঁচান্নব্বই শতাংশ অঞ্চলই গভীর অরণ্যে আবৃত। নানা বৈচিত্র্যে ভরা সেই বিরাট সুন্দরের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র দেখার সুযোগ পেয়েই এই ভ্রমণে অভিভূত হয়েছি বার বার। সেদিনের গভীর অরণ্যের বুকের তলে "মাতৃক্রোড়ে শিশুদের" সেই অনাবিল ছবির স্মৃতি আজও মনে অমলিন হয়ে আছে।

ক্লিংম্যান্স ডোম থেকে দেখা স্মোকি মাউন্টেন ন্যাশনাল পার্ক

~ *গ্রেট স্মোকি মাউন্টেনের আরও ছবি* ~

ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের (জি এস আই) প্রাক্তন কর্মী কালিপদ মজুমদার তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে নিযুক্ত ছিলেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নানান প্রত্যন্ত এবং দুর্গম অঞ্চলে। অবসর গ্রহণের পর সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সুযোগ আসে। সেখানে অবস্থানকালে বিশাল সেই দেশের যে সামান্য কিছু অংশ ভ্রমণের সুযোগ হয় তার মধ্যে "দি গ্রেট স্মোকি মাউন্টেন্স ন্যাশনাল পার্ক" একটি অন্যতম সুন্দর স্থান। সেই বিরাট সুন্দরের বর্ণনার প্রয়াসে 'আমাদের ছুটি'-তে কলম ধরা।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ব্রাজিলে দিনকয়েক

বনানী মুখোপাধ্যায়

~ ব্রাজিলের আরও ছবি ~

গত বছর মেয়ে জামাই আমাকে আদর করে ব্রাজিলে নিয়ে গিয়েছিল। আমার কাছে ব্রাজিল মানে ভূগোলের ম্যাপ আর পেলে। ব্যস। কিন্তু বনানীদির ইচ্ছের সঙ্গে সকলের ইচ্ছে মিলবেনা এটাই সত্যি। অতএব, চলো দিল্লি না বলে চলো ব্রাজিল বলতেই হল।

১৯ ডিসেম্বর ২০১৫, আমাদের বিমান যাত্রা শুরু। প্রথমে নিউইয়র্ক, সেখান থেকে মায়ামি, ওখানে চার ঘণ্টা বসার পর প্লেনে সাও পাওলো। এই নামটা আমার জানা। খবরের কাগজে খেলার পাতায় দেখেছি, সেখানে তিন-চার ঘণ্টা বসে থাকার পর আবার আর একটা প্লেন। তার নাম টাম। এ আবার কেমন নাম? এবার গন্তব্য ইগুয়াজু। এখানকার ফলস নাকি বিশ্ববিখ্যাত। তা হবে। নাম শুনে ভাবলাম আমরা কি জাপানে যাচ্ছি নাকি? নামটা তো সে রকমই। কিন্তু না, এটা ব্রাজিলে। অবশ্য আমার কাছে ব্রাজিলও যা, জাপানও তা। সবই ভূগোল। ওকে, চালাও পানসি ইগুয়াজু।

এখানে একটা মুশকিল, বেশিরভাগ লোকই ইংরিজি জানেনা, হয় স্প্যানিশ, নয় পর্তুগিজ, সর্বনাশের মাথায় পা, কথা বোঝাব কী করে? আমার তেরো বছরের নাতি তিতাসই ভরসা, ও একটু একটু স্প্যানিশ জানে। এই যাত্রায় ওই আমাদের কর্ণধার। পা রাখলাম ইগুয়াজুতে, না, জাপানে নয়, ব্রাজিলেই। হোটেলের নাম - বেস্ট ওয়েস্টন। বেশ ভালো, দেখলে ভক্তি আসে। রেডি হতে না হতেই খাবার সময় হয়ে গেল, ম্যানেজারকে জিগ্যেস করে জানা গেল কাছেই একটা ভাল রেস্তোঁরা আছে নাম - বাফেলো ব্ল্যাঙ্কো। সর্বনাশ! মোষ?? সে কি রে বাবা? মোষের মাংস খেতে হবে? লালমোহনবাবুর কল্যাণে ব্রাজিলের বিচ্ছু তো জানি, কিন্তু ব্রাজিলের মোষ! সেঁটা কি বস্তু?? রাস্তা থেকেই গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। এবার সোজা গিয়ে ঢুকে পড়লাম সেখানে। চারদিক সুন্দর করে সাজানো, বসে পড়লাম সবাই।
তারপর শুরু হল মিউজিকাল চেয়ারের মতো একটা ব্যাপার। একজন এলেন হাতে একটা বড় লোহার শিক, তাতে অনেক মাংস গাঁথা। তেনার আরেক হাতে ভয় পাবার মতো একটা ছুরি, প্রত্যেকের পাতে ওর থেকে কেটে কেটে মাংস দিয়ে চলে গেলেন। তারপর আরেকজন এলেন সেম ছুরি সেম মাংস, আবার একজন একই কেস, তারপর আরেকজন। প্রত্যেকেই ওই লোহার ডাণ্ডা থেকে কেটে মাংস দিয়ে গেলেন। শুধুই মাংস আর কিছুই নেই। ওদেরও হাসি হাসি মুখ, আমাদেরও সেম। কথা নেই। শুধু ইশারা। কী জ্বালাতেই পড়লাম রে বাবা। এরপর জামাইয়ের ইচ্ছেতে তেনার ফটোগ্রাফার বউ রান্নাঘরে গিয়ে ছবি তুললেন, আমরা সকলে বিশাল একটা ছুরি ধরলাম তাতে একটা বিশাল মাংস-র টুকরো। সকলের হাসি হাসি মুখ, বাঃ। এদিকে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া।

পরের দিন। আজ যাওয়া হবে ইগুয়াজু ফলস। কিন্তু ব্রাজিলের দিক থেকে নয়, আর্জেন্টিনার দিক থেকে। উঃ কী সহজেই না নামগুলো লিখছি, কিন্তু বনানীদির কপাল মন্দ তিনি আর্জেন্টিনায় প্রবেশের অনুমতি পাবেন না, কারণ তেনার ভিসা নেই। আগে বলা ছিল ভিসা লাগবে না, এখন বলছে লাগবে। না না কোনও মতেই বনানী মুখুজ্যেকে আর্জেন্টিনায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবেনা। শেষ কথা। মনে মনে বললাম, দুর হ, তোদের দেশে যেতে আমার বয়েই গেছে। আমার সঙ্গীদের তো কাঁদো কাঁদো অবস্থা, মাকে হোটেলে রেখে তারা যাবেনা। অনেক কষ্টে বোঝানোর পর তেনারা রাজি হলেন। মেয়ে খাবারদাবার ফোন সব দিয়ে, টেক্সট কী করে করতে হয় শিখিয়ে দিয়ে, বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে সাত ঘণ্টার জন্যে একা থেকে গেলাম হোটেলের ঘরে। টিভিতে সিএনএন ছাড়া কিছু দেখার নেই, আর সব স্প্যানিশ চ্যানেল, আমার টেক্সটই ভরসা। একবার মেয়েকে আরেকবার আমেরিকায় ছেলেকে ঘন ঘন টেক্সট করতে লাগলাম। ওরা ফেরার পর আবার সেই মাংসের জগতে, আবার লোহার ডাণ্ডা, আবার বিশাল ছুরি।

পরের দিন সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম ব্রাজিলপ্রান্তের ইগুয়াজু ফলস দেখতে। না, এখানে কেউ বনানীদিকে ঢুকতে দেবনা বলেনি। জামাই বাবাজির হাতে জলজ্যান্ত ভিসা। গাড়ি করে গেট পর্যন্ত গিয়ে আবার বাসে করে অনেকটা ভেতরে যেতে হল। দূর থেকেই তেনার গুড়গুড় ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম। বুঝলাম এবার দর্শন পাব। তারপরই দেখলাম সেই অপূর্ব সুন্দর জলরাশি। এধার ওধার সেধার - সবদিক দিয়ে

ছাপিয়ে পড়ছে। অনেকটা নায়াগ্রার মত। একটু একটু করে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি আর আমাদের ডানদিক দিয়ে তিনিও চলেছেন চারদিক উপচিয়ে সশব্দে, সগর্বে।

যদিও জল অনেকটা দূরে তবু তার জোর এতটাই যে আমরা ভিজেই যাচ্ছিলাম। জলের রঙ কখনও সাদা কখনও গেরুয়া। লালমাটি জলে মিশলে যেমন দেখতে লাগে ঠিক তেমন। ব্রাজিলের বেশিরভাগ রাস্তাই লালমাটির। ভাবলাম রবীন্দ্রনাথ কি এখানেও আমাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছেন? একেবারে রাঙা মাটির পথে এনে ফেলেছেন? এই ব্রাজিলে! আর শান্তি করে যে একটু দেখব তারও উপায় নেই। আমার অক্লান্ত অমিত শক্তিশালিনী ফটোগ্রাফারকন্যা তিড়িং বিরিং করে এত ছবি তুলছেন যে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যদিও জানি সে ছবি দারুণ হবে, তবু আমরা তিনটি মডেল পোজ দিতে দিতে ক্লান্ত, কিন্তু তিনি ক্লান্ত নন।

এবার আবার ওপরে ওঠা। আবারও বাসে চেপে চলে এলাম গেটের কাছে - সেখানে গাড়ি আসবে হোটেল থেকে লাগেজ নিয়ে, আর সেটাই চিন্তা, যদি সব লাগেজ না পাই? তাহলে? কী জ্বালা! কাউকে বলতেও পারছিনা, বকুনি খাব। কী করব স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে। যাকগে, ঠিক সময়ে গাড়ি এল। হ্যাঁ সব লাগেজ নিয়ে। পাশেই এয়ারপোর্ট। চলে গেলাম। এবার রিও ডি জেনিরো। বাপ রে, ভূগোল যে তাড়া করে বেড়াচ্ছে! একঘণ্টা পরে পৌঁছলাম সেখানে। লাগেজপত্র নিয়ে বাইরে এসে দেখি, 'Lakshman Srinivasa' লেখা একটা প্ল্যাকার্ড নিয়ে খুশী খুশী মুখে একজন দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে আমাদের দেশের লোকেরই মত।

খানিকটা পথ আসতেই দেখলাম সেই অভূতপূর্ব দৃশ্য। অনেক উঁচুতে পাহাড়ের মাথার ওপর দু হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভগবান যীশু। না, ক্রুশ নেই। সাদা আলখাল্লা পরা। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। যেদিক দিয়েই গাড়ি যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে তাঁকে। অনড় অবিচল। দেখতে দেখতে চলে এলাম সমুদ্রের কাছে। কোপাকাবানা বিচ। কিন্তু হোটেল কোথায়? ঠিকানা দেখে যেখানে দাঁড়ালাম জায়গাটা কলকাতার মহাত্মা গান্ধী রোডের মতো। গিজগিজ করছে লোক, গিজগিজ করছে বাড়ি আর গিজগিজ করছে গাড়ি। তারই সামনে সীবিচ। অদ্ভুত ব্যাপার হোটেলের অ্যাড্রেস মিলছে, কিন্তু নাম মিলছেনা! আসলে ব্রাজিলের ভাষায় নামটা লেখা বলে বোঝা যাচ্ছিল না। দরজার সামনেই গাড়ির ভেতর বসে ছিলাম। ভোগান্তি আর কাকে বলে!

হোটেল নয়, অ্যাপার্টমেন্ট। ন-তলার ওপরে। ঘরে ঢুকে আমি আর নাতি দুজনেই ধপাস, খুবই টায়ার্ড। বাকি দুজন বিচে ঘুরতে গেল। কিন্তু ফিরল মুখে একরাশ মেঘ নিয়ে। শুনলাম বিচে যাওয়া মাত্র লক্ষ্মণের সোনার চেন ছিনতাই হয়েছে, তবে চেনটা নিতে পারেনি, সোনার গণেশের লকেটটা চলে গেছে। প্রথম দিনেই মন খারাপ।

পরের দিন। ২৩ ডিসেম্বর। এই বাড়িটার একটা সুবিধে আছে, উলটোদিকেই ট্রাভেল এজেন্টের অফিস - RIO MAXIMA। সেখান থেকেই বাসে উঠতে হবে। আজ যাব ওই যীশুকে দেখতে। আমার তো হাত পা ঠান্ডা। অত ওপরে উঠব কী করে? কিন্তু বলতে সাহস হচ্ছেনা, তাহলেই শুনব "সব সময় এত নেগেটিভ কথা বোলোনা তো।" অতএব চুপচাপ গিয়ে বাসে উঠলাম আর বসে বসে পজিটিভ কথা ভাবতে লাগলাম।

গাইডটি বেশ ভাল, মাঝারি বয়স, নাম কার্লোস, একবার ইংরেজিতে বলছে, আরেকবার স্প্যানিশে। আমরা ছাড়া আর যারা বাসে আছে তারা কেউ ইংরেজি জানেনা। প্রথমেই যাওয়া হল মহান যীশুর আশ্রয়ে - ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার (CHRIST THE REDEEMER)। এই নামেই উনি পরিচিত - বিশ্বের নতুন সাত আশ্চর্যের একটি। আমি তো ভেবেই যাচ্ছি, কী করে উঠব? বাবা যীশু, কত পাতকীকে উদ্ধার করেছ এবার বনানীদিকেও উদ্ধার করে দাও প্রভু। একটা কোন ব্যবস্থা করে দাও। কী আশ্চর্য, একটু এগোতেই দেখলাম সামনে চলন্ত সিঁড়ি, ওপরে ওঠবার জন্যে, একটু ওঠার পর আবার চলন্ত সিঁড়ি! আমি তো যারপরনাই প্রীত। যীশু কথা শুনেছেন। কিন্তু সবসময়ই যে বনানীদি আনন্দে থাকবেন তার তো কোনও মানে নেই,

তাঁকেও তো প্যাঁচে ফেলতে হবে। তাই ফেলা হল। শেষ চত্বরে পৌঁছবার জন্যে আর চলন্ত সিঁড়ি নয়, রোপওয়ে। ব্যস, সব্বনাশের যেটুকু বাকি ছিল, বাবা যীশু তাও করে দিলেন। কাঁদবারও উপায় নেই, তিন শত্রু- মেয়ে জামাই আর নাতি একদৃষ্টে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। নাতির হাত ধরে অসীম সাহসে ভর করে উঠে পড়লাম সেই শূন্যে ভাসন্ত কামরাতে। চারদিকে কাঁচের জানলা, সব দেখা যাচ্ছে। দম বন্ধ করে যীশুবাবাকেই ডাকছিলাম।

অবশেষে পৌঁছলাম সে জায়গায় - কোরকোভাদো পাহাড়ের চূড়ায়। যীশুর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচু করে দেখতে হচ্ছে - বিশাআআল মূর্তি, সাদা আলখাল্লা পরা, দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে, যেন সবাইকে আশ্বাস দিচ্ছেন - তোমাদের কোনও ভয় নেই, আমি আছি। চোখে জল এসে গেল। নিজেকে বড্ড ছোট মনে হচ্ছিল। ভাবছিলাম এই জায়গায় আসার জন্যে এত ভয় পাচ্ছিলাম! ছিঃ। তবে মনে মনে একটু অহংকারও হচ্ছিল এই অসামান্য মূর্তিটা দেখতে পেলাম বলে। এবার নীচে নামার পালা, একেবারে বিজয়িনীর মত গট গট করে রোপওয়েতে চেপে, চলন্ত সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, অসীম সাহসী হয়ে নেমে এলাম। ওপরের চত্বর থেকে ব্রাজিল দেখা একটা অভিজ্ঞতা। কোনদিন ভুলবনা।

এবার গন্তব্য রিও-র বহু পুরনো চার্চ, চারদিক খুব সুন্দর করে সাজানো, সিলিঙটা লালনীল কাঁচ দিয়ে ঘেরা। অপূর্ব দৃশ্য। অত লোক, সারিবদ্ধ হয়ে দেখছে, কিন্তু কেউ একটু শব্দ করছে না। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। বুকের ধক ধকও। যেতে যেতে মারকানা ফুটবল স্টেডিয়াম দেখতে পেলাম ওরা নেমে গেল, আমি না। ওখানে এখন না আছে পেলে না আছে মারাদোনা, তো আমি গিয়ে কী করব? এরপর যেখানে রিও-র বিখ্যাত কার্নিভাল হয়, সেখানে নামা হল, যে পোশাক পরে ওখানে মেয়েরা নাচে, আমার বীরাঙ্গনা কন্যা অবলীলায় সেই পোশাক পরলেন আর ছবিও তুললেন। মিথ্যে বলবনা, দেখতে ভালই লাগছিল।

এবার লাঞ্চ, আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের সামনেই রেস্তোঁরা, সেখানে বাসের সবাই খেতে গেলাম। ব্যুফে। অসুবিধে একটাই - কেউ একটা শব্দও ইংরেজি জানেনা। মোটামুটি ইশারাতেই সব সারতে হচ্ছে।। এরপর যাওয়া হবে সুগার লোফ-এ (SUGAR LOAF)। এটা একটা বিশাল পাহাড়ের চারদিকে রাস্তা, রেলিং দেওয়া। তাই ধরে ঘুরতে ঘুরতে ওপরে ওঠা। না কষ্টও হয়নি, বুড়ি বনানীদি ব্রাজিলে আসবে এ তো কল্পনারও অতীত ছিল। কী জানি, আরও কী কী দেখা বাকি আছে!

২৪ ডিসেম্বর, আজ এখানে ছুটির দিন, অফিসকাছারি বন্ধ। অতএব আজ কোথাও যাওয়া নেই। সারাদিন সমুদ্রের পাড়ে বিচরণ কর। খাও-দাও কেনাকাটা কর। কিন্তু কোনোক্রমে ওই দামী ক্যামেরাটি বিচে নিয়ে এসো না, তাহলে তক্ষুনি অন্যের করায়ত্ত হয়ে যাবে। অতএব মনের দুঃখে বনে না গিয়ে সবাই সাগর নিয়েই সারাটা দিন কাটিয়ে দিল। বিকেলে আবার বিচে গিয়ে দেখলাম সব আলোয় আলোকময়। বড়দিনে কোপাকাবানা বিচও সেজেছে। সান্টা দাদুও গাড়ি করে ঘুরে গেলেন। বেশ ভাল লাগছিল।

২৫ ডিসেম্বর, আজ আমরা অরণ্যচারী হব। কেন? জানিনা। কিছুতেই বলতে পারলাম না - আরে বাবা, আমি কী করতে জঙ্গলে যাব! সাদামাটা নাটক লিখি। ওসব জঙ্গল নিয়ে উপন্যাস লেখার কোনও ইচ্ছে নেই। কিন্তু চোরা না শোনে ধরমের কাহিনি। আমাকে যেতেই হবে। শুনলাম, ওখানে নাকি অনেক বাঁদর আছে, শুধু বাঁদর দেখতে যাব? বাঃ, শুনে পরান জুড়িয়ে গেল। আবার সেই একই জায়গা থেকে বাসে উঠলাম। ক্লারা বলে একটি মেয়ে, সে-ই গাইড, সঙ্গে আর একজন আছেন। অনেকটা বেঁটে, নৃপতি চাটুজ্জের মত দেখতে। ষাট কী পঁয়ষট্টি মতো বয়স হবে। ভাল ইংরেজি বলেন। অনেকটা পথ যাওয়ার পরও জঙ্গল আর আসে না।। কোথায় সীতা কোথায় সীতার মতো কোথায় জঙ্গল, কোথায় জঙ্গল বলে হাঁপিয়ে উঠেছি তখনই তিনি এলেন। ইতিমধ্যে আর একটি অল্পবয়সী মেয়ে বাসে উঠেছে, সে আমাদের নতুন গাইড আলেক্সা; ভারী হাসিখুশি, ইংরেজিও ভাল বলে। সে আর নৃপতিবাবু একবার স্প্যানিশ আর একবার ইংলিশ বলতে বলতে চললেন। এটা রেইন ফরেস্ট, নাম তিজুকা ন্যাশনাল পার্ক। রিও শহরের অনেকটা এলাকা জুড়ে এই জঙ্গল নাকি বিশ্বের বৃহত্তম আর্বান ফরেস্ট। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, রাস্তার দু ধারে প্রচুর কাঁঠাল গাছ দেখলাম। বড় বড় কাঁঠাল ঝুলছে দেখে ভাবছিলাম, আচ্ছা, এরাও কি এঁচোড়ে পাকে? নাকি সেটা শুধু বঙ্গসন্তানদের জন্যেই প্রযোজ্য? এছাড়া কলাগাছও প্রচুর। ছোট ছোট মোচা ঝুলছে। রঙটা একটু পার্পল ধরনের। কেমন খেতে কে জানে! ছোলা, ঘি-গরম মশলা দিয়ে রান্না করলে কি একইরকম লাগবে? প্রচুর জবা গাছও দেখলাম। নানা রঙের জবা। বিশাল ঝরনা, অনেক দূর থেকে নেমে আসছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম ওখানে। আর একটু উঁচুতে উঠে দেখলাম ব্রাজিলের শেষ সম্রাটের খাওয়ার জায়গা। বিরাট চত্বর। জঙ্গলে বেড়াতে এসে রাজামশাই এখানে সদলবলে খাওয়াদাওয়া করতেন। বাগানে দোলনাটা দেখে মনে হচ্ছিল, ওখানে যারা দোল খেত, সেই রাজকুমারীরা কেমন দেখতে ছিল? সুন্দর? কেমন পোশাক পরতো?

ইতিমধ্যেই আলেক্সার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে। এসো, চলো আর ভালবাসি, এই তিনটে বাংলা কথাও শিখে গেছে। থেকে থেকেই বলছে - চ - লো, এ--- সোঁ আর ভা---- লো---- বা-- সি। আমাকে তো 'মম, মম' করে মাথা খেয়ে দিচ্ছে। আমার সঙ্গে ছবিও তোলা হল। হেঁটে হেঁটে হয়রান হওয়ার সময় মনে হচ্ছিল যেন অরণ্যের দিনরাত্রি। আলো-আঁধার মেশা বড় বড় গাছের ছায়ায় সবাই মিলে বেড়াবার অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

ফিরে এসে রাত্তিরে আবার বিচ। আলোয় ঝলমল করছে। খাওয়াদাওয়া সেরে ঘরে ফেরত এলাম। আমাদের ঘরের জানলা দিয়ে উলটোদিকের বাড়িটার অনেকগুলো অ্যাপার্টমেন্ট দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকটাতে খ্রিস্টমাস ট্রি সাজানো। একেকটা ঘরে এক-এক রকম পর্দা। এক-এক রকম লোকজন। একটা ঘরের বারান্দায় এক বুড়ি ঠায় বসে আছে। আর একটা ঘরে সাত-আটটা ছেলেমেয়ে খুব সেজেগুজে বসে গিটার হাতে গানবাজনা করছে। অন্য আরেকটা ঘরে একজন লোক সমানে পায়চারি করছে, থামছে, বসছে, ব্যায়াম করছে, গেঞ্জি খুলে ফেলছে আবার পায়চারি। হিচককের রিয়ার উইন্ডো (REAR WINDOW) ছবিটার কথা মনে পড়ছিল। মাথায় অনেক প্লটও এসে গেল। দেখা যাক, ফিরে বনানীদির দপ্তর থেকে কী লেখা বেরোয়।

২৬ ডিসেম্বর। আজ আবার বাসে করে বেরনো হল। যা যা দেখবার আছে, সব দেখতে হবে। এদিনের গাইডটি ভীষণ স্মার্ট। বয়স বছর পঞ্চাশ-বাহান্ন হবে। অনর্গল ইংরেজি, স্প্যানিশ আর পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলছে। আমাদের ফটোগ্রাফারও যথারীতি ছবি তুলে যাচ্ছেন, আমরাও যথারীতি পোজ দিয়ে যাচ্ছি। আর সহ্য হচ্ছে না।

বাসে আজ অনেক বেশি লোক। তার মধ্যে দুজন ব্রেজিলিয়ান মহিলা - মা আর মেয়ে, প্রচুর কথা জিগ্যেস করছে গাইডকে। মহিলা আমারই বয়সী হবেন বোধহয়, মাঝে মাঝেই আমার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকাচ্ছেন। বুঝতেই পারছিনা ঘটনাটা কী? এরপর যদি ক্যাচ-কট-কট হয়ে যাই তাহলে তো অনর্থ হয়ে যাবে। বনানীদি পুরো বেসামাল। আমার কথা উনি বুঝবেননা, আর ওনার কথা আমিও। মনে মনে বললাম, বাবা যীশু, উদ্ধার কর। প্রথমে একটা মিউজিয়াম দেখে তারপর রাজার প্রাসাদ। খাসমহলে ঢোকার আগে নিজের জুতোর নীচে আর একটি বিশেষ জুতো পড়তে হবে, তারপর পা ঘসে ঘসে ভেতরে যেতে হবে। আমার কপালে এমন জুতো এল যার ভেতর আমার পুরো ফ্যামিলি ঢুকে যাবে। একেবারে নাকানিচোবানি অবস্থা।

বিশাল মহল, বিশাল বিশাল অনেক ঘর; রাজা, রানি, রাজপুত্র, রাজকন্যে - সবার ঘর। এছাড়া খাবার ঘর, বসার ঘর, পড়ার ঘর, গান শেখার ঘর। ঠিক সেই আসবাব দিয়ে, সেই ভাবেই রাখা আছে। চারদিকে সোনা রুপো হীরে চুনি পান্নার ছড়াছড়ি। মনে হচ্ছিল যেন হীরকরাজার দেশে এসেছি। রাজার মুকুটটা দেখে অবাক লাগছিল। মনে মনে ভাবছিলাম, যিনি প্রথম পরেছিলেন না জানি কেমন দেখতে ছিলেন!

বাইরে এসে বসলাম, আর ওরা গেল ছবি তুলতে। আর তক্ষুনি বুঝলাম কী ভুল করেছি। আমি ধৃত হলাম। আগে থেকেই সেখানে বসে আছেন ওই মহিলা। আমাকে ওঁর ভাষায় যীশুর জীবনী শোনাবার চেষ্টা করলেন। আমি হাসি হাসি মুখে বোঝবার ভান করতে লাগলাম। একবার বললেন - মাদার তেরেসা? কাল কুটা? ইন্ডিয়া? মাথা নাড়লাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে বললাম মাদার তেরেসা। ব্যস, মহিলা খুব খুশি।

এরপর লাঞ্চ। খেতে হবে। কী খেলামটা বলতে পারবনা। ভাতের মত একটা কিছু, তার সঙ্গে স্বাদগন্ধহীন চিংড়িসেদ্ধ। সবাই খাচ্ছে। আমিও খেয়ে নিলাম। এরপর আরও দু-একটা জায়গা দেখা হল, যদিও সেগুলো খুব একটা দেখার মতো নয়, তবু যাওয়া হল। কাল চেকআউট করব।

রাত্রে কোপাকাবানা বিচে আবার টহল দিলাম। মন খারাপ করছিল। অনেকক্ষণ বসে থেকে চলে এলাম। কাল আবার নতুন যাত্রা শুরু হবে। এবার পেরু - সেখানে রয়েছে ইনকাদের প্রাচীন রাজধানী মাচুপিচু, সেও আরেক আশ্চর্য।

বিদায় ব্রাজিল, বিদায় অতন্দ্রপ্রহরী সদাজাগ্রত যীশু।

~ *ব্রাজিলের আরও ছবি* ~

মধুসংলাপী নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের কন্যা বনানী মুখোপাধ্যায় নিজেও অত্যন্ত জনপ্রিয় শ্রুতিনাট্যকার। শিশুকাল থেকেই নাটকের পরিবেশে মানুষ। ইচ্ছে ছিল মঞ্চ অভিনেত্রী হওয়ার, কিন্তু হলেন নাট্যকার। হয়তো সেটাই ভবিতব্য ছিল।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select - ▼

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

পরিযায়ীদের সংসারে

পলাশ পান্ডা

পাখি দেখার কৌতূহলটা বরাবরের। জানুয়ারির ভরা শীতের রাতে তাই লেপের মায়া কাটিয়ে ঠান্ডাকে নিতান্ত উপেক্ষা করেই ট্রেনে উঠে বসি, গন্তব্য চুপিচর। শীতের কয়েকটা মাস বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর চুপিচরে পরিযায়ীদের এক মেলা বসে। ওখানকার স্থানীয় মানুষেরা যে ভাবে চরটিকে চোরাশিকারীদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁদের বিশেষ বাহবা দিতে হয়। চুপিচর গঙ্গার ধারে এক অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ রূপে বিস্তৃত হয়েছে। এর বিস্তার প্রায় ২-৩ কিমি। শীতকালে হ্রদটি পরিযায়ীদের আস্তানাতে পরিণত হয়। পরিচিত এক বন্ধু দেখলাম উৎসাহী, তাকেই সঙ্গী করে ২৬ জানুয়ারি বেরিয়ে পড়লাম চুপিচরের উদ্দেশ্যে।

পূর্বস্থলী যেতে গেলে সবথেকে সহজ পরিবহণ হল ট্রেন। সারাদিনই হাওড়া থেকে কাটোয়া লাইনে প্রচুর লোকাল ও মেল ট্রেন চলাচল করে। ঠিক করেছিলাম সকাল ৫.৩৬ মি.-এর ট্রেনটা ধরব। রাত দেড়টায় বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু হাওড়াগামী লোকালটি সামান্য লেট করায় প্রথম ট্রেন মিস করলাম। অগত্যা ৬.২৬ মি.-এর মেইন লাইনের ব্যান্ডেলগামী লোকালে চেপে ব্যান্ডেলে নেমে ট্রেন পাল্টে পূর্বস্থলী পৌঁছালাম সাড়ে নটা নাগাদ। রাস্তাতে খাওয়া হয়ে ওঠেনি, স্টেশনে নেমে প্রথমেই চা আর টিফিন করে নিলাম। স্টেশনেই চুপিচর যাওয়ার জন্য প্রচুর অটো, টোটো ও রিকশা পাওয়া যায়। টোটোতে চেপে চরে পৌঁছাতে মিনিট দশেক সময় লাগল। নামতেই চোখে পড়ে গেল বিরাট একটি সাইনবোর্ডে সমস্ত নিয়মকানুন সহ নৌকার রেটচার্ট লেখা রয়েছে।

ব্ল্যাকহেডেড আইবিস

ঘাটে গিয়ে ঘণ্টায় ১২৫ টাকা হিসেবে এক মাঝির সঙ্গে কথা বলে নৌকায় উঠে বসলাম। ছুটির দিন হওয়ার জন্য ভালোই ভিড় জমেছে। চরের পাশে পার্কে পিকনিক করবার ব্যবস্থাও রয়েছে। সেখানে স্কুলের কিছু বাচ্চা এসেছে পিকনিক করতে। ছোট ছোট নৌকায় করে পক্ষীপ্রেমীদের দল গোটা হ্রদটাতে বিচরণ করছে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের কাছে দেখলাম বড় মাপের লেন্স লাগানো ক্যামেরা, অনবরত শাটারের শব্দ কানে আসতে লাগল। নৌকার মাঝিই আমাদের গাইড। দেখলাম উচ্চারণগত ত্রুটি কিছুটা রয়ে গেলেও মাঝিভাই পাখিদের নাম ভালোই রপ্ত করেছেন। নৌকায় উঠতে না উঠতেই তিনি ইশারা করে দেখালেন সামনে কচুরিপানার মধ্যে কয়েকটা কমন কুট আপন মনে খাবার খোঁজায় ব্যস্ত। এমন ভাবে কচুরিপানার মধ্যে মিশে রয়েছে যে প্রথমটায় চোখেই পড়ছিল না, নৌকাটা একটু এগোতে দেখতে পেলাম। তারপর লগি ঠেলে বামদিক বরাবর নৌকো এগোতে লাগল। খানিক এগোতে দেখি কয়েকটা লিটল গ্রিব ঘোরাঘুরি করছে। একটু কাছে যেতেই ছপাত ছপাত শব্দ করে উড়ে গেল। এরপর যেখানে নিয়ে গেলেন, দেখি গোটা তিরিশ-চল্লিশ শামুকখোল জটলা পাকিয়ে রোদ্দুর পোয়াচ্ছে। একটু দূরে একটা কালোমাথা কাস্তেচোরা জলের মধ্যে খাবার খোঁজায় ব্যস্ত। ঠিক সেই সময় মাঝি দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন - একঝাঁক বালিহাঁস আমাদেরই নৌকোর পেছনে এসে নামল। খুব কাছাকাছি থাকায় বেশ কয়েকটা ভালো ছবি পাওয়া গেল। এরই মাঝে দেখতে পেলাম পার্পেল হেরন, পার্পেল সমফেন, গ্রে হেডেড ল্যাপউইং, জলময়ূর, জলপিপি, জিরিয়া, বালুবাতান আর অজস্র পানকৌড়ি।

কিন্তু মূলত যাকে দেখবার জন্য এতদূর ছুটে আসা সেই রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড-এর দেখা এখনও পর্যন্ত পেলাম না। এই রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড সম্পর্কে দু-একটা কথা না বললেই নয় - এদের স্ত্রী ও পুরুষকে সহজেই চেনা যায়। পুরুষদের গোল কমলা মাথা, বুকটা কালো, পেটটা সাদা ও ওপরটা বাদামী এবং লেজটা কালো হয়। আর স্ত্রীদের প্রধানত বিবর্ণ বাদামী শরীর ও মুখটা সাদাটে হয়ে থাকে। এরা সবসময় দলগত ভাবে থাকে ও বিচরণ করে, কিন্তু অন্য কোন প্রজাতির মধ্যে মিশে যায়না। এদের খাবার খোঁজার ধরণ হল জলে ডুব দিয়ে। প্রধানত জলজ উদ্ভিদ খায়। লেকের ধারে বাসা বাঁধে ও একসঙ্গে আট থেকে বারোটা ডিম দেয়। ডিমের রঙ কিছুটা বিবর্ণ সবুজ। মাঝিভাইকে এদের কথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি এক গাল হেসে বললেন, একটু সবুর করুন দেখতে পাবেন। তাঁর কথায়, এ বছর নাকি প্রচুর পরিমাণে রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড এসেছিল, তার মধ্যে কিছু চলে গেছে। তবে যা রয়েছে তার পরিমাণও

কটন পিগমি গুজ

নেহাত একটা কম নয়। হাতে সময় খুব একটা বেশি নেই তাই অনুরোধ করলাম পোচার্ড-এর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য। তিনি সেইমত নৌকার মুখ ঘুরিয়ে এগোতে লাগলেন।

শীতের অলস দুপুরে গ্রামের মেয়েরা স্নানের জন্য ঘাটে আসতে শুরু করেছে, দুটো ছোট ছেলে একটা ডিঙি নিয়ে খেলার ছলে ঝিলের জলে এপাশ ওপাশ করছে। কিছুটা দূর যাওয়ার পর দেখলাম একঝাঁক সরাল কোথা থেকে ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে আমাদেরই নৌকার সামনে জলে নামল। যেখানে নামল সেখানে চোখ পড়তে দেখলাম একটা পার্পেল হেরন ও কিছু পানকৌড়িও আগে থেকে বসে রয়েছে। শুরু হল জলক্রীড়া, ওদের ডানার আওয়াজে চারিদিকের নিস্তব্ধতাটা ভেঙে গেল। খেলায় এত মগ্ন যে কিছু কিছু সরাল আমাদের নৌকার কাছাকাছি চলে আসছিল। সামনে পেয়ে কিছু ছবি নেওয়ার পর ধীরে ধীরে ওদের পাশ কাটিয়ে এগোতে লাগলাম। এগোনোর পর যে দৃশ্য দেখলাম তা দেখে চোখ স্থির হয়ে যাওয়ার উপক্রম। ঝাঁকে ঝাঁকে রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড জলে ভেসে বেড়াচ্ছে। মাঝিভাইকে বললাম যতটা কাছে যাওয়া যায় চলুন, সেই মত ধীরে ধীরে ওদের কাছে নৌকো এগিয়ে যেতে লাগল। পাশাপাশি আরও কয়েকটা নৌকো এসে দাঁড়িয়েছে। কয়েকটা নৌকো আরও কাছে যাওয়ার চেষ্টা করতে পাখির দল ছপাত ছপাত করে উড়ে গিয়ে একটু দূরে বসল। দু চোখ ভরে দেখতে লাগলাম। মনটা এক অবর্ণনীয় আনন্দে ভরে উঠল। যে আশা নিয়ে শীতের রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম তা যেন সত্যিই আশাতীতভাবে সফল হল। এবার খুশী মনে ফিরতে পারব।

লেসার হুইসলিং ডাক

রেড-ক্রেস্টেড পোচার্ড

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের কম্পিউটার অপারেটার পলাশ পান্ডা-র সখ ফোটোগ্রাফি ও বেড়ানো।